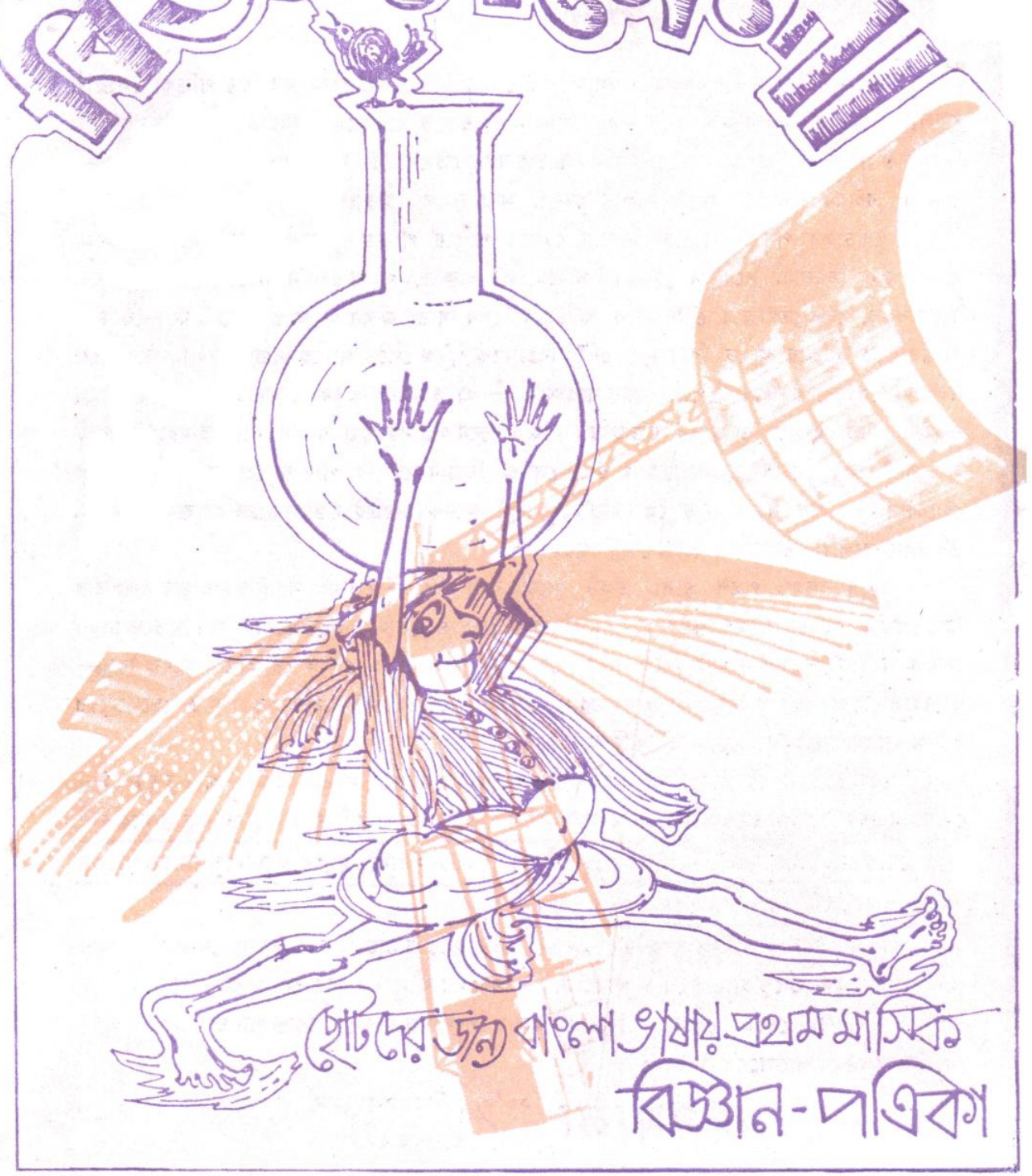

জানুয়ারী ১৯৮২ • পৌষ ১৩৮৮ • দেড় টাকা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

আমাদের কথা

জমজমাটী মেজাজে অভিনব সাজে এই তো সেদিন বেরুল তোমাদের প্রিয় পত্রিকা '**বিজ্ঞান মেলা**'। নুপুরের রিনিঝিনি শুনে বরণডালা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলে তোমরাই। এরপর বছরজুড়ে বিজ্ঞান মেলা নিয়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ, মাসের গোড়ায় বই হাতে পেলেই নেচে-কুঁদে অস্থির, — হাসিমুখের মেলা। বইয়ের মেলায় শুধুই বিজ্ঞান মেলা, আর তুমুল হৈ-হল্লা।

বৈচিত্রের পসরা পেয়েছো বিজ্ঞান মেলার পাতায় পাতায়। ঋতুবৈচিত্রের মতোই মেজাজ, সাজগোজটা ছিমছাম, তবে আকর্ষণীয়। খামখেয়ালী প্রকৃতি, ঋতুপরিবর্তন, নিত্যদিনের পালাপার্বন, অসুখবিসুখ, দেশ-দেশান্তরে রোমাঞ্চকর অভিযান এসব ঘিরেই জীবন। আর জীবনের ফাঁক-ফোঁকড়ে অন্ধিসন্ধিতে লুকিয়ে আছে বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানকে খুঁজে পেতে আনছে বিজ্ঞান মেলা, তাকে সহজ সরল মন-কেড়ে-নেয়া ভাষায় পৌঁছে দিচ্ছে ঘরে ঘরে, — প্রতি মাসের একদম গোড়ায়। এখানে আছে রকমারি ফিচার, গল্প ও ছড়ার ছড়াছড়ি। ছিঁচকাঁদুনে গল্প নয়, কল্প বিজ্ঞান নিয়ে তোমরা হুটোপাটি লুটোপাটি করো, চেটেপুটে সাপটে খাও। সেজন্য বিজ্ঞান মেলার পাতায় প্রোফেসার শঙ্কু থেকে রোব্বোস, ইকারাস সবাই ছড়ি ঘোরাচ্ছে। আরো অনেক চরিত্রই দস্তানা হাতে আস্তিন গোটাচ্ছে, এই এলো বলে। একটু ধৈর্য ধরো, ছোট্ট বন্ধুরা।

ছোট্ট বন্ধুরা, পাশে এসো, একটি কাজের কথা বলি, — তোমরা সবাই তড়তড়িয়ে সফলতার শীর্ষে ওঠো, আমরা আনন্দ পাবো। হ্যাঁ, বিজ্ঞান মেলাও তোমাদের সাফল্যের সারথি হতে চায়। সেজন্য থাকছে পড়ুয়ার দপ্তর, নিজে করো, তোমাদের পাতা এসব, এবং আরো আরো অনেক কিছু— যা সরাসরি তোমাদের পরীক্ষার কাজে লাগবে। তোমরা দেখেছো এরই মধ্যে নামকরা কৃতি ছেলেমেয়ের দল আদর্শ প্রশ্নোত্তর নিয়ে কেমন জাঁকিয়ে বসেছে।

তোমরা এতো ছেলেমেয়ে গ্রাহক হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছো, সত্যিই আমরা অভিভূত। মনে রেখো, (এখন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক আঠারো টাকা, পূজো সংখ্যার জন্য বাড়তি কিছু লাগবে না। দপ্তর থেকে সরাসরি হাতে নিলে মাত্র ষোল টাকা। টাকা সরাসরি দপ্তরে জমা দিতে পারো, বা মনি অর্ডার কিংবা পোসটাল অর্ডারেও পাঠাতে পারো)।

বিজ্ঞান মেলার তাঁবুতে আজ উপ্‌চে পড়ছে ভীড়, হ'য়ে উঠেছে জিজ্ঞাসু মনের মেলা। বিজ্ঞান মেলার জ্যামজমাট ভীড়ে হারিয়ে গেছি আমরা সবাই, এরচেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে।

ভালকথা, খেয়াল রেখো — বিজ্ঞান মেলার সম্পাদকীয় দপ্তর কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে। এখন থেকে সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা :

জয়মালা
২৯/২, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিজ্ঞান মেলা—বাংলায় ছোটোদের জন্য প্রথম মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। বেরোচ্ছে প্রতি ইংরাজী মাসের একদম গোড়ায়।

●

সম্পাদকীয় দপ্তর

২৯/২, বেনিয়াটোলা লেন
কোলকাতা-৭০০০০৯
ফোন—৪৭-৬৯৮০

●

সম্পাদকমণ্ডলী

সুভাষ সান্যাল
কৃষ্ণা ঘোষাল
মৃণালকান্তি সাহা

●

সম্পাদক

অমিত চক্রবর্তী

●

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
১৮ টাকা (সডাক)

●

অমল ঘোষ কর্তৃক ২৯/২ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কোলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞান মেলা

জানুয়ারী ১৯৮২ * ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা * পৌষ ১৩৮৮

চিত্রে কল্পকাহিনী/সূর্যপাড়ি | ৩

ছড়া

টাক থেরাপি | সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৪

বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প

হিমাইৎগঞ্জের নবাবজাদা | ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ৫

পিঁপড়ে পুরাণ | প্রেমেন্দ্র মিত্র ২৫

সায়েন্স-ফিক্‌সন্

রোবোবাস | হীরেন চট্টোপাধ্যায় ১৯

জ্ঞান-বিজ্ঞান

শীতের আকাশ | গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ১০

বিশ্ব জুড়ে বিচিত্র প্রাণ | কৃষ্ণা ঘোষাল ১৫

শীতের মরশুমে খাওয়া দাওয়া | অমিয়কুমার হাটি ২৩

হাই ওঠে কেন ? | জীবন ভৌমিক ৩২

বিজ্ঞানী

বরাহমিহির | অরূপরতন ভট্টাচার্য ২৭

নিয়মিত বিভাগ

বিজ্ঞানের খবর ৩ শরীর-স্বাস্থ্য ১৩ মনের জানালা ১৭

জানো কি ? ২২ নিজে কর ২৯ পড়ুয়ার দপ্তর ৩০ ধাঁধা ৩৬

ডাঃ বিনোদবিহারী নিয়োগী স্মৃতি প্রতিযোগিতার

ফলাফল (বিজ্ঞানের স্মরণীয় আবিষ্কার) ৩৪

প্রচ্ছদ | মিহির রায়

অলঙ্করণ | মানিক সরকার/কল্যাণ চক্রবর্তী/দীপঙ্কর রায়

খবর

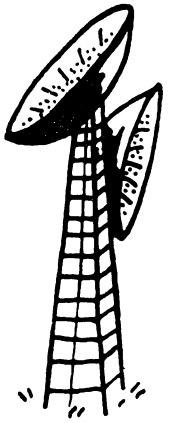

ভাস্কর—২

২০শে নভেম্বর, ১৯৮১। সময় বেলা দুটো।

সোভিয়েত রাশিয়ার ভল্‌গোগ্রাডের কাছাকাছি এক মহাকাশ বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল ৪৪৪ কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহ ভাস্কর—২। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হাতে গড়া। শুধু মহাকাশে পাঠাতে গেলে দরকার উন্নত ধরণের মহাকাশ বন্দরের। তাই বিমানে করে একে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সোভিয়েত মহাকাশ বন্দরে। যাত্রার পঁচিশ মিনিট বাদেই শুরু হলো ভাস্কর—২ এর পৃথিবী প্রদক্ষিণ। বিষুবরেখার সঙ্গে ৫১° কোণে নত থেকে পৃথিবীর ৫৩৫ কিলোমিটার দূরে গিয়ে ভাস্কর—২ ঘুরপাক খাওয়া শুরু করল। একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য এখন ভাস্কর—২ এর সময় লাগছে মাত্র ১৫.১৬ মিনিট। যাত্রার ঠিক এক ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট পরেই ভাস্কর—২ সংকেত পাঠানো শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ভাস্কর—২ এর টি-ভি ক্যামেরা ভারতীয় উপমহাদেশের অগুণতি ছবি তুলেছে। শুধু তাই নয়। নির্ভুল ভাবে বাতাসের জলীয়বাষ্পের মাত্রার মাপজোক করে চলেছে। আরও পাঠাচ্ছে এমন কিছু খবর যা আমাদের আবহাওয়ার হালচাল বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়াও অবহেলিত রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে ভাস্কর—২ এই উপমহাদেশের অনেক নতুন সম্পদের ভাঁড়ারের হদিস দেবে। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী, ভাস্কর—২ এর বছরখানেক মহাকাশে কর্মব্যস্ত থাকার কথা।

কৃত্রিম হৃদ্‌পিণ্ড!

মানুষের শরীরে কৃত্রিম অঙ্গপ্রতঙ্গ লাগানোর জন্য মস্কোয় যে কেন্দ্র রয়েছে সেখানকার বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কুড়িটিরও বেশী কৃত্রিম হৃদপিণ্ড তৈরী করেছেন। এই সমস্ত কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড জন্তু জানোয়ারের ওপরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। অবশ্য এটা ঠিক, আরো অনেক গবেষণার পরই জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের জায়গায় যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড বসিয়ে কাজ চালানো যাবে। রুশ বিজ্ঞানী ভালেরি শুমাকভের মতে, মানুষের তৈরী নিখুঁত হৃৎপিণ্ড প্রস্তুত হতে এখনো নাকি ২৫—৩০ বছর সময় লাগবে।

তুষরে দাম!

ধানের ঝাড়াই-মাড়াই শেষ হয়েছে অনেকদিন। সেই ধান সেদ্ধ হয়ে, মেশিনে কিংবা ঢেঁকিতে ছেঁটে নতুন চাল হয়ে বেড়িয়ে এসে যখন হাঁড়িতে ফুটতে থাকে তখন কে আর মনে রাখে ফেলে দেওয়া ধানের তুষের কথা। এখন অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলছেন—ধানের তুষ নাকি মোটেই ফেলনা জিনিষ নয়। দেখা গেছে, তুষের ১৫ থেকে ১৭ শতাংশই হ'ল 'সিলিকা'—যা থেকে তৈরী হয় বিশেষ ধরণের সিলিকন। এই সিলিকন বিভিন্ন ধরণের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে এমনকি মহাকাশযানের 'সৌরকোষ' তৈরীর কাজেও লাগে। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাঁধছে ঐ সিলিকাকে তুষ থেকে আলাদা করার ব্যাপারে। তুষ পুড়িয়ে যে ভূষোকালির মত জিনিস তৈরী হয়, তার থেকে সিলিকন তৈরী করতে গেলে খরচার বহরটা যা হবে তাতে ঢাকের দায়ে মা মনসা বিকিয়ে যাবে। কিছুদিন হল ধানবাদের কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণা সংস্থা ধানের তুষ থেকে সিলিকা-যুক্ত 'হোয়াইট অ্যাশ' তৈরীর এক সহজ উপায় বার করেছেন। এর ফলে সিলিকা তো পাওয়া যাবেই, উপরি লাভ হিসেবে মিলবে 'অক্সালিক অ্যাসিড'—রাসায়নিক কারখানায় যার চাহিদা নেহাৎ কম নয়।

সূর্যপাড়ি

(রুশ কল্পকাহিনী অবলম্বনে)

(শেষ)

ছড়া

টাক থেরাপি

সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

একটা লোকের ছিল মস্ত টাক,
টাক নয় তো মস্ত সে এক ঢাক ;
কঞ্চি দিয়ে
খুব পিটিয়ে
সবাইকে সে লাগিয়ে দিল তাক।

কিন্তু কেন টাক পড়েছে কারণটা তার কি,
ডায়গোনিসিস করলে দেব হাজার টাকা ফি।
কেউ বলে টাক বংশগত, কেউ বা বলে মনের ;
অশান্তিতে টাক পড়েছে মেজাজী বাপ ধনের
কেউ বা বলে পেটের রোগে, কেউ বা কালাজ্বরে,
আঁতেল লোকের আ-তেল মাথায় জমকালো টাক পড়ে।
কেউ বা বলে চুল উঠেছে টাক পড়েছে তাই ;
চুলের পেটে বেজায় ক্ষিধে তাই করে খাই খাই !
চুল বলে রোজ খাব খাব—ভাইটামিনের অভাব,
রুটিন মাফিক প্রোটিন খাওয়া জন্মগত স্বভাব ;
চুলের পেটে জ্যান্ত ছুঁচোর কাঁচুর-মাচুর ডাক,
আসল কারণ কেউ জানে না, তাই পড়েছে টাক !
তেল চক্‌চক্‌ টাকের কারণ ! জানতে কি কেউ চায় ?
টাকের রোগে টাক পড়েছে সন্দেহ নেই তায় !!

গল্প

হিমাইৎগঞ্জের নবাবজাদা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

রবিবার। কাল থেকে একটু শীতের আমেজ দিচ্ছে। ফলে সকালে উঠতে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা নিয়ে বসেছি। কাল কলেজে একটা সেমিনার আছে, কিছু বলতে হবে, তারই খসড়া করছি মনে মনে, হঠাৎ বাইরে একটা মোটর গাড়ী তারস্বরে হর্ণ বাজাতে শুরু করল।

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, সত্যি একটা বিরাট বিদেশী গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে আমাদেরই বাড়ীর সামনে আর তা থেকে দামী আচকান আর চোস্ত পরা এক ভদ্রলোক নামছেন। তবে কি হিমাইৎগঞ্জের নবাবজাদা এলেন! আমারই বাড়ীতে? কী কাণ্ড!

পরক্ষণেই রামচরণ একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, "লাইব্রেরী ঘরে বসে আছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আমার মত সামান্য একজন অধ্যাপকের ঘরে অমন খানদানী বংশের একজন নবাবজাদার হঠাৎ আসবার কারণ কি? অবশ্য ওঁকে আমি চিনি। ঘটনাচক্রে আলাপেরও সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু—

কিন্তু, না। হাজার হোক, জমিদারী না থাকলেও একজন মানী লোক এবং ততোধিক ধনী। কাজেই এক চুমুকে বাকী চা-টুকু শেষ করেই উঠে পড়তে হ'ল।

"কি ব্যাপার? আপনি! হঠাৎ?"

নবাবজাদা উঠে নবাবী কায়দায় ঘাড়টা একটু সামনের দিকে হেলিয়ে বললেন, "বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি প্রফেসার রয়! আপনি তো একজন অ্যামেচার ডিটেক্‌টিভ?"

হাসতে হাসতে বললাম, "আ-মি ডিটেক্‌টিভ! ওঃ, সেবার একটা রহস্য উদ্ধার করে দিয়েছিলাম বটে! সেই গল্প শুনেই এখানে ছুটে এসেছেন? কিন্তু সেটা তো ছিল অনেকটা কাকতালীয় ব্যাপার। আমার ভূমিকা তাতে খুব বেশি ছিল না।"

"না না, অস্বীকার করবেন না। আপনার কথা আমি আরও কয়েকজনের কাছে শুনেছি, বড় বিপদে

পড়ে গেছি। পুলিশ এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তাই আপনার মতই একজন—"

"একজন সায়েন্সের অধ্যাপক চাই, এই তো?" —আমি তেমনি হাসতে হাসতে জবাব দিলাম।— "আচ্ছা ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুন তো?"

নবাবজাদা বললেন, "জমিদারী চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের এখনও কিছু ধনসম্পত্তি রয়ে গেছে,—যা সরকার নিতে পারেন নি। নেহাত কমও নয়। তার মধ্যে খুব দামী কিছু হীরে জহরতও ছিল। নানান্ জাতের ছোট বড় হীরে, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত এইসব। চুণী-পান্নাও অজস্র।—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তারই কোনটা চুরি গেছে নাকি? কোনও ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখেন নি?"

"কত আর রাখা যায়?"—নবাবজাদা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আপনাকে সব খুলে বলছি।

"জানেন তো এক সময়ে আমাদের বংশের এ তল্লাটে খুব নামডাক ছিল। কয়েক পুরুষ ধরে আমার পিতামহরা নবাব খেতাব পেয়ে আসছিলেন, সেই সূত্রে আজও আমাকে লোকে নবাবজাদা বলে, এবং আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই, এ নিয়ে আজও আমার এবং আমার বেগম সাহেবের গর্ব আছে। কেউ খোঁটা দিলে সহ্য করতে পারি না। আর হীরে-জহরতের গল্প করতে ভালোও লাগে।

"কিন্তু কে খোঁটা দিতে যাবে?"

"দিয়েছে বই কি! দুনিয়ায় তো কত রকম লোক আছে! অপরকে হেয় করতে পারলেই তারা মজা পায়। সেদিন এক্স-ল্যাণ্ডলর্ড্স ক্লাবে কয়েক-জন প্রকাশ্যে এই নিয়ে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। আমিও বাঘের বাচ্চা, বললাম, বেশ, আমার কি আছে না আছে তা এক্জিবিট করে দেখাব। একেবারে সকলের সামনে সাজিয়ে।

"বলে তো ফেললাম। তার পরেই মনে হ'ল কাজটা ঠিক হ'ল না। অত ছোট ছোট. কিন্তু অসম্ভব মূল্যবান জিনিস সকলের সামনে বার করে সেগুলি নিরাপদে রাখা যাবে তো?

"কিন্তু মরদ কা বাৎ হাথীকা দাঁত। যা বলেছি তা করবই। ওর জন্য দশ-বিশ হাজার টাকা খরচা করতে হয় সে ভি আচ্ছা।

"ভেবেচিন্তে, অনেক পরামর্শ করে সব ব্যবস্থা করা হ'ল। লোহার শিক দিয়ে চারদিক্ আটকানো একটা ঘরের মত বড় খাঁচা তৈরী করা হ'ল—ঠিক যেমন চিড়িয়াখানায় হিংস্র জন্তুদের জন্য করা হয়। ঠিক হ'ল সেই খাঁচা বা ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর হীরে-জহরৎগুলো খোলা অবস্থায় সাজানো থাকবে, লোকে খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়েই স্পষ্ট সেগুলো দেখতে পাবে। খাঁচার শিকগুলো বেশ মোটা আর এমন ভাবে সাজানো যে একটা ছোট ছেলেও তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে না। আর আমার এক বিদেশী এঞ্জিনীয়ার বন্ধুর পরামর্শ মত সমস্ত ঘর জুড়ে এলোমেলো ভাবে অসংখ্য তার টাঙ্গিয়ে দিলাম, আর সেই তারের ভিতর দিয়ে বেশ হাই ভোল্টেজের ইলেকট্রিক কারেণ্ট জ্বালিয়ে রাখা হ'ল। কেউ সে তার ছুঁলেই দারুণ শক্ খেয়ে ছিটকে তো পড়বেই, অজ্ঞান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অথচ ওগুলো এড়িয়ে হীরে জহরতের কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়।

"এত করেও আমার মন ভরল না। চারজন বন্দুকধারী পাহারাদার রেখে দিলাম ঘরটা সর্বদা পাহারা দেবার জন্য। আর আমার একটা অ্যাল-সেশিয়ান কুকুর আছে। ভারী প্রভুভক্ত আর

তেমনি তেজী। তাকে রাত্রে ছেড়ে রাখবার ব্যবস্থা করলাম খাঁচাটার ঠিক বাইরে।"

"তার পর?"

"তার পর খবর পেয়ে দলে দলে লোক আসতে লাগল। সবাই তো দেখে তাজ্জব। আমি তো মহাখুশি, বেগম সাহেবা আরও খুশি। এবার দেখুন এসে হিংসুকের দল—আমি ঝুট কথার লোক নই। মরা হাতীও লাখ টাকা। আপনাকেও একদিন ডাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু তার মধ্যেই এমন একটা অঘটন ঘটে গেল যার মাথামুণ্ড কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

"কি রকম?"

"প্রদর্শনী শুরু হবার দু'দিন পরেই হঠাৎ দেখা গেল বেশ কয়েকটি মূল্যবান রত্ন উধাও হয়েছে। তার পর দিন আরও কয়েকটি। কিন্তু খাঁচাটা—মানে ঘরটা এত সুরক্ষিত ছিল যে এটা একটা অসম্ভব ঘটনাই বলা যেতে পারে। এমন কি মিঃ রডারিক শুদ্ধু অবাক হয়ে গেছেন।"

"রডারিক? তিনি কে?"

"ও, উনি এখানকার লোক ন'ন। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এখানে মাস কয়েক হ'ল বেড়াতে এসেছেন। ভারি চমৎকার স্বভাব। এ দেশটা ওঁর খুব ভাল লেগেছে। ওঁর পরামর্শ মতই তো ঐ তারগুলি টাঙ্গিয়ে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"

ডিটেকটিভগিরি করার তেমন আগ্রহ না থাকলেও নবাবজাদাকে অসন্তুষ্ট করতে মন সরল না! বললাম, "চলুন, একবার দেখে আসি।"

অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা·····কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে আছে।

অমন দামী গাড়ীতে এর আগে কখনও চড়ি নি। সীটে বসতেই মনে হল যেন এক তাল মাখনের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।

সত্যি, নবাবজাদা মিছে বলেন নি। এমন সুরক্ষিত জায়গায় হীরে জহরতগুলো রাখা হয়েছিল যে কল্পনা করা যায় না। বিদ্যুতের তারগুলো এমন ভাবে টাঙানো যে তা এড়িয়ে ওর কাছে ঘেঁষতে অতি বড় সাহসীরও সাহস কুলোবে না।

বন্দুকধারীরা পাহারা দিচ্ছিল, আমাদের দেখে অ্যাটেন্‌শন্ হয়ে দাঁড়াল। পাশে অ্যালসেশিয়ান

কুকুরটা শুয়ে ছিল, কিন্তু তার মধ্যে কোন তেজী ভাব চোখে পড়ল না। কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। কেমন যেন ফ্যাকাসে,—রক্তশূন্য হলে যেমনটা দেখায়। আমাদের দেখে সেটা একবার মুখ তুলে চাইল, কিন্তু প্রভুকে দেখে গদগদ হয়ে এগিয়ে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কাছে গিয়ে দেখলাম তার একটা পা যেন কিসে কেটে গেছে, তখনও একটু একটু রক্ত ঝরছে। পা-টা কাটল কি করে? পাহারাদাররাও কোন যুৎসই জবাব দিতে পারল না।

কথা বলতে বলতে নবাবজাদার খাস কামরায় এসে বসলাম। আর তার একটু পরেই সেই রডারিক সাহেব এসে হাজির। মনে হল, বেশ হাসিখুশি লোকটি। কিন্তু নবাবজাদার জন্য সমবেদনায় তারই মধ্যে থেকে থেকে সে মনমরা হয়ে উঠছিল।

দক্ষিণ আমেরিকায় থাকেন শুনে কৌতূহল হল, কারণ আমিও বছর দুই আগে একবার ও অঞ্চলটা ঘুরে এসেছি। তাই আলাপটা সহজেই জমে উঠল। "আপনার কি মনে হয়", জিজ্ঞাসা করতেই ঠোঁটটা বেঁকিয়ে পোর্তুগীজসুলভ ভঙ্গীতে বললেন, "সেটাই তো প্রবলেম।"

বাড়ী ফিরে নিজের লাইব্রেরী ঘরে এসে বসলাম। বই সংগ্রহ করা আমার একটা বাতিক। হঠাৎ কি খেয়াল হল, দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে একটা বই খুলে পড়তে লাগলাম। কিন্তু চোখের সামনে তখনও ভাসছে সেই অ্যালসেশিয়ানটার ফ্যাকাসে রক্তশূন্য চেহারা আর পা থেকে বেরিয়ে পড়া রক্ত।

তারপর পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে গেলাম। নাঃ, আর একবার নবাবজাদার বাড়ী যেতে হবে, এবং এখনই।

নবাবজাদাকে বললাম, রডারিক সাহেবকে বড় ভালো লেগেছে, তাঁর সঙ্গে আর একটু আলাপ করতে চাই। ওঁর ঠিকানা দিন। ঠিকানা নিয়ে তখনই ছুটলাম রডারিকের হোটেলে।

একটা নামী হোটেলের একটা ভালো ঘর নিয়ে আছেন উনি। নীচে খবর নিয়ে লিফ্‌টে করে চলে এলাম ওঁর ঘরে। হোটেলের একটা বেয়ারা ঘরটা সাফ করছিল, বলল, "সাহেব বাথরুমে গেছেন, এখনই আসবেন।"

"একটু দাঁড়াই তাহলে"—বলে ঘরের আনাচে কানাচে চোখ বোলাতে লাগলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা পাখীর খাঁচা। খাঁচার মধ্যে দুটো ছোট ছোট পাখী চক্‌চক্ করে লাল কি যেন একটা খাচ্ছে। কৌতূহল আরও বাড়ল। সাহেব আসবার আগেই তা মেটাতে হবে। পায়ে পায়ে গিয়ে দেখি, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। পাখী নয়,—ছোট ইঞ্চি তিনেক মাপের দুটো বাদুড়, চক্‌চক্ করে একটা পাত্র থেকে তাজা রক্ত খাচ্ছে।

রডারিক বাথরুম থেকে এসেই হঠাৎ আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। মুখে একটা কৃত্রিম হাসি এনে বলল, 'প্রফেসর রায়! আপনি এখানে?"

"আপনার সঙ্গে আর একটু আলাপ করতে এলাম। এ দুটো তো মনে হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। দক্ষিণ আমেরিকায় ওদের দেখেছি। রক্ত ছাড়া আর কিছু খায় না। তা ও দুটি বুঝি আপনার পোষা?"

রডারিক একটু ইতস্ততঃ ভাবে বলল, "হ্যাঁ নিজেদের দেশের সব কিছুই আমার ভালো লাগে। তাই ও দুটিকেও সঙ্গে করে এনেছি।"

একটু লোক দেখানো খেজুরে আলাপ করে

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে এলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম থানায়।

মিনিট দশেকের মধ্যেই একজন পুলিশ অফিসার আর কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে ফের ঢুকলাম রডারিকের ঘরে। সে তখন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। বোধহয় আজই দেশে রওনা হবে।

পুলিশ অফিসারটি বজ্রকণ্ঠে হাঁকলেন, "কোথায় রেখেছেন জহরৎগুলো? বার করুন।"

"জহরৎ!" রডারিক যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"হ্যাঁ, জহরৎ। বহু মূল্য হীরে জহরৎ যা আপনি ঐ পোষা ভ্যাম্পায়ার দুটোকে দিয়ে চুরি করিয়েছেন —এবার জবাব দিলাম আমি। কনস্টেবলরা তখনই রডারিকের স্যুটকেস খুলে ফেলল, আর তারই মধ্যে পাওয়া গেল বেশ কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন।

রডারিক এই আকস্মিক ব্যাপারে এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। তাকে পুলিশের জিম্মায় দিয়ে তখনকার মত বাড়ী ফিরে এলাম।

হ্যাঁ, ডিটেকটিভগিরিই করতে হয়েছিল আমাকে আর এবারেও আমি ফুল নম্বর নিয়ে পাশ।

সব বাদুড়েরই বিশেষ একটা ক্ষমতার কথা আমার জানা ছিল। শব্দ তৈরী হয় বাতাসে একটা বিশেষ ধরনের কাঁপুনির সৃষ্টি হলে। প্রতি সেকেণ্ডের কম্পন সংখ্যা যাকে ইংরেজীতে বলে ফ্রিকোয়েন্সি, তারই ওপর শব্দটা নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের মানুষদের শ্রবণশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। কম্পন সংখ্যা অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি যদি সেকেণ্ডে কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার পর্যন্ত হয় তবেই তা আমরা শুনতে পাই। এর কম বা বেশি হলে সে শব্দ সৃষ্টি হলেও আমাদের কানে তা ধরা পড়ে না, বাদুড় কিন্তু পারে। সেকেণ্ডে এক লক্ষ কম্পন সংখ্যা হলেও তা তাদের কানে ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, বাদুড় নিজেরাও ঐ ধরণের শব্দ করতে পারে যা শুনবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এই ধরণের শব্দকে বলা হয় আলট্রাসোনিক সাউণ্ড। বাংলায় শ্রুতিপারের শব্দ। এখন, বাদুড় উড়বার সময় এই রকম আলট্রাসোনিক শব্দ করতে করতে চলে। সে শব্দ যদি কোন জায়গা থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসে--ঐ আলট্রাসোনিক শব্দ হয়েই, তাহলে বাদুড় তা ঠিক ধরতে পারে এবং অন্ধকারেও তার অস্তিত্ব টের পেয়ে সেটা এড়িয়ে চলতে পারে। রডারিকের এই পোষা বাদুড়গুলোরও ছিল সেই ক্ষমতা। কাজেই খাঁচার ভিতর রাতের অন্ধকারে ঢুকে তারা ঐ আলট্রাসোনিক শব্দ তৈরি করে ইলেকট্রিক তার থেকে তার প্রতিধ্বনি শুনে শুনে অবলীলাক্রমে তা এড়িয়ে এড়িয়ে উড়তে পারবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আর এই বাদুড়গুলো হল ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। যারা আকারে এক একটা বড়জোর তিন ইঞ্চির বেশি হয় না। কাজেই শিক্ষিত পোষা ভ্যাম্পায়ার রাতের অন্ধকারে খাঁচার ফাঁক দিয়ে ঢুকে ইলেকট্রিকের তারের জাল এড়িয়ে হীরা জহরৎগুলো তুলে আনতে পারবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার প্রথম সন্দেহ জেগেছিল দক্ষিণ আমেরিকার কথা শুনে, কারণ এই জাতীয় বাদুড় ঐ অঞ্চলেই কেবল দেখা যায়। দ্বিতীয় সন্দেহ হল অ্যালসেশিয়ানটার অমন রক্তশূন্য নির্জীব চেহারা দেখে আর তার পা থেকে রক্ত গড়াতে দেখে। এই বাদুড়গুলো রক্ত ছাড়া আর কিছু খায় না আর এদের মুখে এমন সূক্ষ্ম দাঁত আছে যা অনেকটা ইঞ্জেকশনের ছুঁচের মতই কোন ঘুমন্ত প্রাণীর দেহ থেকে নিঃসাড়ে রক্ত চুষে নিতে পারে। এমনভাবে যে যার রক্ত

নেওয়া হচ্ছে সে তা টেরও পায় না। তাছাড়া সাধারণতঃ পায়ের আঙুল থেকে রক্ত চুষে নেওয়াই এদের স্বভাব। রক্ত টেনে নেওয়া হয়ে গেলে তারপরই শুরু হয় রক্তপাত যা অ্যালসেশিয়ানের বেলায় আমার চোখে পড়েছিল।

তারপর রডারিকের হোটেলে গিয়ে স্বচক্ষে একজোড়া ঐ বাদুড় দেখে আর রডারিক তাদের রক্ত খেতে দিয়েছে দেখে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে আর দেরী হল না। পুলিশ এসে চুরি করা হীরে জহরৎগুলোও বার করে ফেলল। আমার জয় জয়কার।

জানি না, এরপরেও আবার হয়তো আমার ডাক পড়বে ডিটেকটিভগিরি করার জন্য। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি ডিটেকটিভ নই, ওটা আমার পেশাও নয়। আমার পেশা কলেজে পড়ানো। সেটা ঠিকমত করে যেতে পারলেই আমি খুশি।

জীবাণুসার

● অ্যাজোটোবেকটার ●

জমির উর্বরতা ও ফলন বাড়ায়, গাছ দ্রুত বাড়ে, ঝাঁকড়া হয় ও সতেজ থাকে, ফুল ও ফলের আকার বড় হয়, দানা পুষ্ট হয়, গাছের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ছত্রাক-রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়, জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

● রাইজোবিয়াম ●

বাদাম, সয়াবীন ও সমস্ত ডালচাষে 'রাইজোবিয়াম' জীবাণুসার ব্যবহার করুন। রাইজোবিয়াম ফলন বাড়ায় এবং পরবর্ত্তী ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন জমিতে সঞ্চিত রাখে।

প্রস্তুতকারক :-নাইট্রোফিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ

(ভারত সরকার অনুমোদিত)

ব্লক ডি, জয়শ্রী পার্ক কলিকাতা-৭০০০৩৪

ফোন : ৭৭-৩৩২৬, ৭৭-১৪৯০

জ্ঞান-বিজ্ঞান

শীতের আকাশ

ডিসেম্বর মাস শেষ করে জানুয়ারীর দিকে পা বাড়াচ্ছি। এরই মধ্যে সূর্য একদিন পাটে বসল, সন্ধ্যাও নামল। ইতিমধ্যে নজরে এল পশ্চিম দিগন্ত থেকে। কিন্তু উত্তর আকাশ ঘেঁষে, স্তিমিত উজ্জ্বল সাদা মেঘের মত ছায়াপথ আকাশকে মেখলা পরিয়েছে। এই ছায়াপথের মধ্য দিয়ে একটু উপরে উঠে এলাম, দেখলাম কয়েকটি নক্ষত্র, এমনভাবে সাজানো যেন এক বলাকা, দুদিকে দুটি মেলে দেওয়া ডানা, সামনে প্রসারিত কণ্ঠদেশ, পশ্চিমে উড়ে চলেছে। এ হল হংসমণ্ডল বা Cygnus। এর লেজের প্রান্তে হংসপুচ্ছ বা Deneb, সূর্যের ৮,০০০ গুণ উজ্জ্বল এবং ৬৫০ আলোকবর্ষের মতন দূরের নক্ষত্র। এর কণ্ঠ-দেশের দুদিকে দুটি তারা। দক্ষিণভাগে হল শ্রবণা বা Altair, শ্যেনমণ্ডল অর্থাৎ Aquila-র অন্তর্গত, আর উত্তরভাগে হল অভিজিৎ বা Vega, একটি প্রথম প্রভার তারা, বীনামণ্ডল অর্থাৎ Lyra-র অন্তর্গত। তবে কথা হল রাতও বাড়বে, এদেরও আর দেখা যাবে না।

হংসমণ্ডলের পিছনে, আরও একটু উপর দিকে, কিন্তু সেই ছায়াপথে আর একটু উত্তর দিক ঘেঁসে, অন্য আর এক তারামণ্ডল—সুন্দর দেখতে, নাম যার কাশ্যপী বা Cassiopea, ইংরেজী W অক্ষরের সঙ্গে যার দারুণ মিল!

এরই কাছে চোখ পড়ে যায় হালকা পেঁজা তুলোর মতন গোল আকারের এক জ্যোতিষ্কে। ওটা

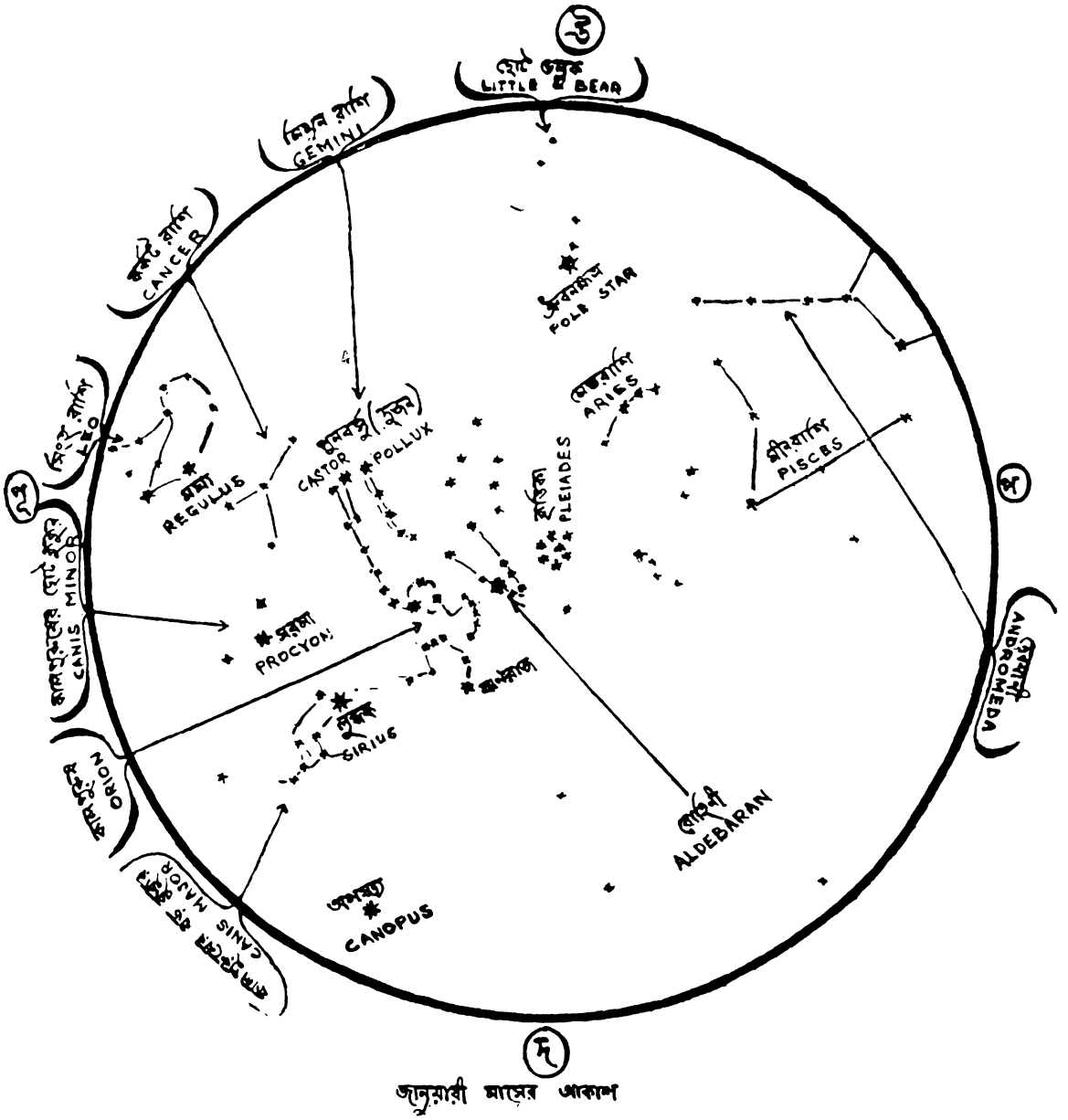

আসলে একটা নক্ষত্রজগৎ বা Galaxy, যাকে বলা হয়েছে দেবযানী বা Andromenda। কোটি কোটি নক্ষত্রের সমাহারে বহু দূরের জগৎ ওটা, কুড়ি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে।

পশ্চিম আকাশে, উত্তর আকাশে সফর শেষ করলাম কারণ যাদের কথা বললাম – শীতের আকাশে কিছু সময়ের জন্য হলেও উত্তর দিকে এরাই প্রধান, এরাই সুন্দর। এখন পাড়ি জমালাম মাঝ আকাশে। সেখানে তারার গুচ্ছ, দুটি কিংবা সাতটি কিন্তু খালি চোখের মাধ্যমেই এদের দেখছি, যদিও দূরবীনের

মাধ্যমে জেনেছি যে সেখানে দুশোরও বেশী নক্ষত্র জোট বেঁধেছে। এখন যে নক্ষত্রপুঞ্জ, নাম এর কৃত্তিকা বা সুরাইয়া Pleiades।

সন্ধ্যা রাত্রির আকাশ-পর্যবেক্ষণ আপাতত স্থগিত রাখলাম! এখন নিশুতি রাত, সময় ১২টা।

সন্ধ্যা যখন নেমেছিল তখন দেখেছিলাম পূব আকাশে কালপুরুষ উঁকি-ঝুঁকি মারছে। তখন, এই মাঝ রাত নাগাদ দেখা গেল কালপুরুষ বা Orion মাঝ আকাশ পার করছে। ব্যাধ অথবা শিকারী, বীর অথবা যোদ্ধার বেশে সজ্জিত অপূর্বসুন্দর কালপুরুষ বাস্তবিক শীতের আকাশের মধ্যমণি তারামণ্ডল। এর মাথার কাছে মৃগশিরা। যার থেকে পেয়েছি মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস। যেমন কৃত্তিকা থেকে কার্তিক মাসের নামকরণ হয়েছে। ডান কাঁধের কাছে উজ্জ্বল তারাটার নাম আর্দ্রা বা Betelgeuse, যার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ৪০০ গুণ আর উজ্জ্বলতায় যেটি সূর্যের ১,২০০ গুণ। দূরত্ব এর ২০০ আলোকবর্ষ। পায়ের কাছে বানরাজ (Rigel)।

কালপুরুষের কোমরবন্ধে তিনটি ঝকঝকে নক্ষত্র, পরস্পর সমদূরত্বে অবস্থিত। এদেরই সাহায্যে সামনে যদি একটি সরলরেখা টেনে এগিয়ে চলি তাহলেই দেখা পাব রোহিনী বা Aldeberan নক্ষত্রের। এও ভারী উজ্জ্বল আর ঈষৎ লালচে রংয়ের। বৃষরাশির অন্তর্গত এটি।

কালপুরুষের ডান পায়ের কাছে, কিন্তু নিচের দিকে, জ্বলজ্বলে যে নক্ষত্রটাকে দেখছি সেটা আকাশের মধ্যে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এ হল লুব্ধক বা Sirius, ৮½ আলোকবর্ষ দূরে।

আর, কালপুরুষের মাথার পিছনে দুধারে সমান্তরালে কয়েকটি নক্ষত্র নেমে এসেছে। মিথুন রাশি অথাৎ Gemini। যেন যমজমূর্তি, পাশাপাশি, ভারী সুন্দর। এদের মাথার কাছে দুটি নক্ষত্র, পূর্ণবসুদ্বয় Caster এবং Pollux।

* * *

ইতিমধ্যে আপাতত থামতে পারি। রাত আরও একটু গড়িয়ে গেল। এখন সময় রাত ৩টে।

মাঝ আকাশ পার করে নিচে নামছে, একটু পশ্চিম দিকে, অপরূপ আর এক তারামণ্ডল। সিংহ-রাশি অর্থাৎ Leo। থাবা পেতে বসে আছে, পশ্চিম মুখো—আকারে বিরাট। সিংহের সঙ্গে সাদৃশ্যটা যথাযথ বুঝতে পারা যায়। সামনের পায়ে মঘা নক্ষত্র অর্থাৎ Regulus, পিঠের প্রান্তে পূর্বমণ্ডলী বা Yosma, আর লেজের প্রান্তে উত্তরমণ্ডলী বা Denebola।

আর, সিংহরাশির কাছাকাছিই রয়েছে শনিগ্রহ, যদিও দৃষ্টিটা এর বক্রী।

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
(জি, এস)

Space Donated By

Mahendra Traders

7, Gobinda Paul Lane,
Calcutta-700002

শরীর-স্বাস্থ্য

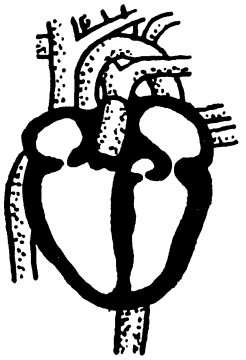

হার্ট এবং ই-সি-জি

"এই কি পরীক্ষার রেজাল্টের নমুনা ?"

—মার্কসীটটা উল্টে-পাল্টে টুম্পাকে ফেরত দিতে দিতে ছোটমামা বললো—"আমাদের সময় যারা এইটিনথ বা নাইনটিনথ পজিশন পেতো তাদের মার্কসগুলো হতো এইরকম। এ রকম বাজে নম্বর নিয়ে তুই সেকেণ্ড কি করে হলি ?"

টুম্পা বললো—"সেটা তো আমারও আশ্চর্য লাগছে। ইংরেজী আর অঙ্ক—দুটোই বাজে পরীক্ষা হয়েছে, রেজাল্ট নিতে গিয়ে রীতিমতো বুক ঢিবঢিব্ করেছে—বরাতে কি আছে কে জানে ? রেজাল্ট নিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড ! অঙ্কই বাঁচিয়ে দিয়েছে, অন্যগুলোর মার্কস যা হয়েছে তাতে সেকেণ্ড কেন, টেন্থও হওয়া যেত না।"

গাবলু আলমোড়া ভেঙ্গে বলল—"তাহলে দিদি, তোরও মাঝে মাঝে বুক ঢিবঢিব করে ? আমি তো জানতাম তুই কিছুতেই নার্ভাস হোস না।"

—"বাজে বকিস না। আমি নার্ভাস হলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যেই মার্কসীট নিয়ে রোলকল শুরু হলো, আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে হঠাৎ বলে—আমার ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে, দম আটকে আসছে, ঘেমে নেয়ে একাকার। আসলে কিছুই না—স্রেফ নার্ভাসনেস। যখন দেখলো টেষ্টে অ্যালাউ হয়ে গেছে দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠলো।"

ছোটমামা এতক্ষণ চুপ করে কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। ইজিচেয়ারে হেলান দিতে দিতে বলল—"আসল ব্যাপারটা হলো অহেতুক ভয়। টুম্পার বন্ধু নার্ভাস হয়ে গিয়ে যেরকম করেছে বললো, আসলে এর সঙ্গে বহু হার্টের অসুখের প্রাথমিক রোগ লক্ষণের ভারী মিল ! যত ভয় বা দুশ্চিন্তা থাকবে হার্টের অসুখের সম্ভাবনাও তত বেশী।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সত্যবাবু বললেন—"আসলে ঐ ভয় আর দুশ্চিন্তার জন্য দায়ী তোমরাই, মানে ডাক্তাররা। কালকে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম—বলে কিনা আমাকে ফলের রস, মাখন তোলা দুধ, তরকারী সেদ্ধ—এইসব খেতে হবে। এক গাদা ওষুধপত্র লিখেছে আবার বলেছে একটু 'ই-সি-জি-টা'ও করিয়ে নিন। এসব শুনলে দুশ্চিন্তা কমবে না বাড়বে ?"

টুম্পা বললো—"বাবার ঐ স্বভাব। অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। একটু সাবধানে থাকতে দোষ কি ?"

সত্যবাবু বললেন—"না তা নয়, তবে ই-সি-জি শুনেছি ঝামেলার ব্যাপার। শকটক্ লাগে না তো ?"

ছোটমামা হাসলো। —"কেন ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের প্রথমে ইলেকট্রো আছে বলে কি সেটা শক মারবে ?"

—"না তা নয়। ব্যাপারটা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কিছু নেই তো, তাই বলছিলাম—"

—"খুব সহজ ব্যাপার। জানলে আর ভয় থাকবে না। গাবলু—মানুষের হার্ট রেট কতো ?"

চুইংগামের প্যাকেট খুলতে খুলতে নির্লিপ্তভাবে গাবলু বললো—"দিনে লাখ বার।"

—"ঠিক বলেছিস। দিনে লাখ বার অর্থাৎ মিনিটে সত্তর বাহাত্তর, এই ছন্দটা বজায় রাখছে কে ?"

টুম্পা বললো—"এর উত্তরটা জানি বলে মনে হচ্ছে। তুমি 'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোডের কথা বলছো তো ?"

সত্যবাবু বললেন—"এ সব চলবে না। মামা ভাগ্নীতে এমন কোন কথা বলা উচিত নয় যেটা আমাদের কানে ল্যাটিন বলে মনে হচ্ছে।"

ছোটমামা বললো—"কিছু ল্যাটিন ব্যাপার না। হার্টটা যদি একটা চার-কামরাওয়ালা বাড়ী হয়, তাহলে বাড়ীর মেন সুইচ মানে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোডটা বসান রয়েছে ওপর তলার ডানদিকের ঘরের পেছনের দেওয়ালে।"

চুইংগামটা টেনে লম্বা করতে করতে গাবলু বললো—

"অর্থাৎ তুমি বলছো ঐ মেন-সুইচ অফ-অন হয়ে আমাদের হার্টের ছন্দটা ঠিক থাকে ?"

টুম্পা বললো—"মোটেই সে কথা বলা হয়নি। সুইচ 'অফ' হলে আর দেখতে হবে না। সুইচ সব সময়ই 'অন' থাকছে ; সেখান থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ সারা হার্টে ছড়িয়ে পড়ছে।"

—"আসলে এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। মেন সুইচ থেকে যেমন লাইন বিভিন্ন ঘরে যায় তবে এখানে সিষ্টেমটা একটু আলাদা।" ছোটমামা একটু নড়েচড়ে বসলো।

—"সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ তৈরী হলেও সেটা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব কিন্তু তার নয়।"

—"তাহলে সেটা ছড়াচ্ছে কে ?"

—"বলছি রে বাবা, বলছি। আসলে শান্ত পুকুরে ঢিল ফেললে তরঙ্গের মতো ঢেউ উঠতে দেখেছিস তো ? এখানেও ব্যাপারটা তাই। সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড থেকেও বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সেই রকম ঢেউ-এর মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গকে 'রিলে' করার জন্য আর একটা ষ্টেশন আছে যার নাম 'অ্যাট্রিও ভেন্টি_কিউলার' বা সংক্ষেপে 'এ ভি নোড'। এটাও ডান অলিন্দের দেওয়ালে থাকে, তবে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোডের মতো ওপর দিকে নয়, বরং নীচের দিকেই নিলয়ের কাছ বরাবর। এই 'এ ভি নোড' থেকেই ইলেকট্রিক লাইনের মতো সব নার্ভতন্তু সারা নিলয়ে ছড়িয়ে গেছে। ডাক্তারী বই-এ এদের, মানে ঐ সব নোড আর তাদের শাখা-প্রশাখাদের একসঙ্গে বলে 'জাংশনাল টিস্যু।'

সত্যবাবু বললেন—"কথায় কথায় কিন্তু তুমি আসল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছো।"

ছোটমামা বললো—"মোটেই না। এতক্ষণে বরং 'ই-সি জি' প্রসঙ্গে আসার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষুনি বললাম না—সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ 'এ ভি-নোডের মারফৎ সারা হার্টে ছড়িয়ে পড়ছে ? এখন, আমাদের শরীর হচ্ছে বিদ্যুতের সুপরিবাহী। সুতরাং হার্টের মধ্যে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরী হচ্ছে সেটা সারা শরীরেই ছড়িয়ে পড়ছে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহের একটা আন্দাজ দিচ্ছে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম।"

গাবলু বললো—"এই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম যন্ত্রটা কি করে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপছে ছোটমামা ?"

প্রবল বেগে হাত নাড়লো ছোটমামা।—"ইলেক্ট্রোকার্ডিও-গ্রাম নয়, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ। যন্ত্রটার নাম ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ, তার থেকে যে রেকর্ড বা চার্ট আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম। আসলে ই-সি-জিতে আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহটা মাপছি না, বরং যেটা দেখছি তা হলো বিদ্যুৎবিভব মানে 'পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স'।"

সত্যবাবু বললেন—"এটাও তাহলে প্রায় ইলেকট্রিকাল লাইনের মতোই ? ঝপ করে আলোগুলোর জোর কমে গেলে যেমন আমরা ভোল্টেজ ড্রপের কথা চিন্তা করি ?"

ছোটমামা হাসলো। —"ঠিক তাই। হার্ট থেকে যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা তো আর শরীরের সব জায়গায় সমানভাবে পৌঁছোচ্ছে না ? শরীরের দুটো বিন্দুর থেকে যদি আমরা এই তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে একটা 'গ্যালভানো-মিটারে' জুড়ে দিই তাহলে ঐ দুটো বিন্দুর মধ্যে একটা 'তড়িৎ-বিভব' পাব তো ? তবে হ্যাঁ—মাপাটা ভারী ঝামেলার কাজ, কারণ যে তড়িৎ-বিভবটা আমরা পাব তার মাপটা হবে কয়েক মিলিভোল্ট মাত্র।"

টুম্পা বললো—"গ্যালভানোমিটারে তো সেটা ধরাই পড়বে না !"

—"ঠিক তাই। সেজন্যই এই ভোল্টেজকে যান্ত্রিক ভাবে বাড়িয়ে নিয়ে তারপর সেটাকে আমরা দেখি। যখন এটা টি ভি-র পর্দার মতো ছবিতে দেখি তখন সেই যন্ত্রের নাম 'ক্যাথোড-রে-অসিলোস্কোপ' আর সেটা যখন পর্দায় না পড়ে সরাসরি কাগজের ওপর কালি দিয়ে আঁকা হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা বলি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম। আসলে এই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম ছবিটা কিন্তু গোটা হার্টের বৈদ্যুতিক কীর্তিকলাপের ছবি অর্থাৎ ছবির বিশেষ একটা অংশ ডানদিককার অলিন্দের খবর জানায়, কোনটা বা বাঁ দিকের নিলয়ের—এরকম আর কি।"

সত্যবাবু বললেন—"ব্যাপার শুনে এখন মনে হচ্ছে ভয়ের কিছু নেই। কাল পরশু বরং তাহলে একটা ই সি জি করিয়েই নি। কি বলো ?"

● সুভাষ সান্যাল

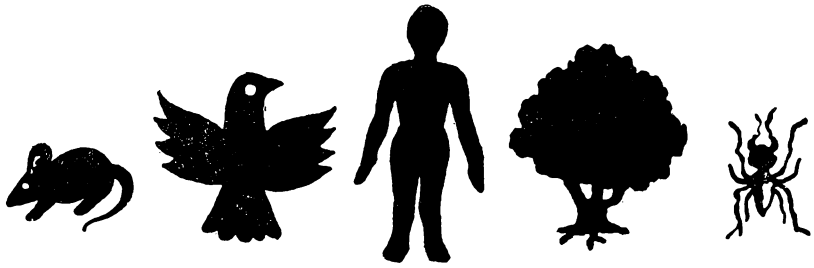

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ

কৃষ্ণা ঘোষাল

একথা মানতেই হয় শীতের দিনে ঘুমিয়ে যেমন আরাম তেমনটি আর বছরের কোনও ঋতুতে হয় না। আরও মজা হোতো যদি সারা শীতকালটাই আমরা ঘুমিয়ে কাটাতে পারতাম। তা কি সম্ভব?

মানুষের পক্ষে সম্ভব না হলেও কিন্তু প্রাণীকুলের অনেকেই শীতকালটা বেশ জমিয়ে ঘুমোয়। ব্যাঙ, সাপ, গিরগিটি, কচ্ছপ, মেঠো কাঠবিড়ালী, শামুক—এরা সকলেই শীত ঘুমে যায়। অনেকে আবার শীতভোর ঘুমোনোর ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু খেয়েও নেয়। তবে এ'দলে যারা তাদের ঘুমটা ঠিক শীতঘুম বা হাইবারনেশন নয়। বরং বলা যায় ঠাণ্ডার কষ্ট এড়াতে নিছক কুঁড়েমি করে ঘুমোয়। শীতঘুম ঘুমোয় যারা তাদের সারা শীতকালটা কিছু খাওয়ার দরকার পড়ে না। হৃদযন্ত্র আর শ্বাসযন্ত্র ছাড়া দেহের আর সব যন্ত্রপাতিই তো অকেজো হয়ে পড়ে শীতে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনও কাজ নেই। শক্তি খরচারও বালাই নেই। তাই শীতের ক'টা মাস এরা না খেয়েও দিব্যি বেঁচে থাকে! হার্টটাকে চালু রাখতে আর দম নেওয়ায় যেটুকু শক্তির দরকার—তা এরা আগে থেকে দেহের ভেতর জমা করে রাখে।

বাতাসে শীতের আমেজ লাগলেই খবর পৌঁছয় মস্তিষ্কে। ব্যাস, দেহকে সক্রিয় রাখার হর্মোন রস তৈরীর মাত্রা কমিয়ে দেয় এখানকার গ্রন্থিরা। দেহও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়। শুধু হার্টের দুপ্‌দাপ্‌ আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আনাগোনা—এটুকুতেই জীবনের চিহ্ন থাকে। তাও এত ধীর গতিতে চলে যে দেখে বোঝা মুস্কিল এরা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

শীতঘুম হোলো ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণীদের শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর এক পন্থা। তবে ঠিক ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী নয় অথচ শীতকালটা স্রেফ ঘুমিয়ে কাটানোর অভ্যেস আছে এমন প্রাণী কিন্তু অনেক আছে।

কয়েক জাতের ভালুক শীতকালে টানা ঘুমোয়—যদিও এটা কিন্তু শীতঘুম নয়। এরা শীতের মরশুমে খাওয়াটাও একদম বাদ দেয় না।

পাখীরা তো শীতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দেশ ছেড়েই পালায়। তবে কেউ কেউ যে শীতটা ঘুমিয়ে কাটায় না তা কিন্তু নয়। আমেরিকান নাইজারেরা শীতকালটা টানা ঘুমায়।

ঠাণ্ডা এলাকার পোকাখেকো বাদুড়েরা শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটাতে পছন্দ করে। ঠাণ্ডা পড়লেই এরা খোঁজে গুহা। সেখানে দিব্যি ঘুম লাগায়।

অনেকটা কাঠবিড়ালীর মত দেখতে এক জাতীয় বুনো নেংটি ইঁদুর আছে যারা শীতকালে ঘুমোনোর জন্যে ঘাসপাতা দিয়ে সুন্দর বিছানা তৈরী করে। শরীর যাতে

একদম ঠাণ্ডা না হয়ে যায় সেই জন্যেই বোধ হয় এই আয়োজন।

আগেই বলেছি, এভাবে যারা শীতটা ঘুমিয়ে কাটায় তারা আগে থেকে হাতের কাছে খাবার জোগাড় করে রাখে। সাপেরা তো রীতিমত খেয়ে নিয়ে লাগায় টানা শীতঘুম। তাই শীতে এদের পাত্তা নেই। গিরগিটিরাও ওই এক কাণ্ড করে। মেঠো কাঠবিড়ালীর দল চলে যায় মাটির নীচে গর্তে। এরা দল বেঁধে শীতঘুমে যায়। তবে এদের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। যখনই এদের ভাঁড়ারে অনেক খাবার মজুত হয়—এরা আর বেরোয় না। তাই অনেক মেঠো কাঠবিড়ালীর দল আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাস থেকেই উধাও হয়ে যায়। আর একজাতের সজারুর মত দেখতে প্রাণী আছে শীতঘুমের সময় যারা কাঁটার আবরণী দিয়ে দেহটাকে মুড়ে রাখে। পোকারা ঠিক শীতঘুম লাগায় না। বেশীর ভাগ পোকারাই জীবনের কৈশোরটা কাটিয়ে নেয় শীতে। ডিম আর পিউপা দশায় থাকায় ঠাণ্ডায় কাবু হয় না এরা। গরমের দিন শুরু হলেই এদের পতঙ্গ জীবনের শুরু হয়। তবে কয়েক জাতের প্রজাপতি আর মথের শীতঘুমেরও অভ্যেস আছে।

শামুকদের ঘুমোনোর ধরণটা বেশ মজার। পরিত্যক্ত ইঁট, কি গাছের গুঁড়ি বা পড়ে থাকা ডালপালা পেলে সেখানেই এরা দলে দলে শীতঘুম লাগায়। খোলসের মুখটা পার্চমেন্ট জাতীয় রাসায়নিক আবরণী দিয়ে বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এই বন্ধ দেওয়ালের বাইরের দিকে আগে থাকতেই আঠা লাগিয়ে দেয়। যেখানে সেখানে সেটে লেগে যায় তাই।

শীতঘুমের চাবিকাঠিটি দেহের কোথায় আছে তা নিয়ে কৌতূহল জাগতেই পারে। দেখা গেছে যারাই শীতঘুম ঘুমায় তাদের দেহে রয়েছে বাদামী চর্বি বলে একটি জিনিষ। দরকার মতো এই বাদামী চর্বিই দেহের উষ্ণতা কমাতে বাড়াতে সাহায্য করে। শীতঘুমের সময় দেহের উষ্ণতা কমই থাকে। তবে কখনও যদি বিপদ দেখা দেয় তখন এই বাদামী চর্বিই দেহ গরম করে এদের জাগিয়ে দেয়। এই বাদামী চর্বির হদিস প্রথম পেয়েছিলেন

সুইশ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী কোনার্ড ডন জেস্‌নার ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে। তবে শীতঘুমের সঙ্গে যে এর সম্পর্ক আছে সে কথা জানার জন্যে বিজ্ঞানীদের আরও চারশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শীতঘুম যখন শুরু হয় তখন তেমন বিপদের ঝুঁকি থাকে না। ঘুমন্ত প্রাণীরা নাড়াচাড়া করলেও অনেক সময়ই এদের ঘুম ভাঙে না। তবে ঘুম ভাঙার সময়টাই বিপজ্জনক। এ সময় দেহের সব যন্ত্রপাতিকে আবার স্বাভাবিকভাবে চালু করতে দরকার হয় প্রচুর শক্তির। তাই দেহের ভেতর জমা শক্তির মাত্রা কম থাকলে এদের এসময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এরকমটা হয় যদি শীতঘুম চলাকালীন এদের বার বার জাগানো যায়।

প্রাণীদের এক অদ্ভুত আচরণ শীতঘুম। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার এ এক অদ্ভুত প্রচেষ্টা।

মনে রাখার উপায়

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। নতুন ক্লাস শুরু হতে অবশ্য এখনও ঢের বাকী ॥ অন্তর তো এখন দারুণ মজা! সারাদিন কাটে ক্রিকেট খেলে আর রেডিওতে ইণ্ডিয়া-ইংল্যাণ্ড টেষ্টম্যাচের রিলে শুনে। অবশ্য অসুবিধেও আছে—শীতকালের ছোট্টবেলা, বিকেল হ'তে না হ'তেই সন্ধ্যে। আর সন্ধ্যে মানেই তো পড়ার টেবিলের সামনে গিয়ে বসা, তা সে পরীক্ষা থাকুক বা নাই থাকুক। সারাদিন হুটোপাটির পর সন্ধ্যেবেলা পড়ার বই-এর সামনে বসে কাঁহাতক আর হাই তোলা যায়? এদিকে বাবার হুকুম—রাত ন'টার আগে শুতে যাওয়া চলবে না।...

সেদিনও সন্ধ্যেবেলা চেয়ারে বসে ক্রমাগত ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ "খিক্" করে একটা হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে সরমাদিকে দেখতে পেল অন্তু। কখন যে সরমাদি নিঃশব্দে এসে সামনের চেয়ারটায় বসেছেন তা টেরই পায়নি ও। প্রথমটায় অপ্রস্তুত হলেও অনেকদিন পর সরমাদিকে দেখতে পেয়ে মনে মনে খুশিই হ'ল অন্তু। সরমাদি হেসে বললেন—কি হে শ্রীমান, আমার ফর্‌মুলা কেমন কাজে লাগল?

অন্তুতো অবাক! বলল—কিসের ফর্‌মুলা?

সরমাদি বললেন—বাঃ রে, পড়া মনে রাখার ফরমুলা। তোমাকে বলেছিলাম না, পরীক্ষায় আসবেই এমন জিনিষগুলো পরীক্ষার আগের দিন রাত্রিবেলা ঘুমনোর ঠিক আগে ভাল করে দেখে নেবে। পরীক্ষার দিন সকালবেলা দেখবে সমস্ত পড়াটা হুবহু মনে পড়ছে।

অন্তু হেসে বলল—না সরমাদি, ও ফর্‌মুলা পরখ করা হয় নি। সন্ধ্যে থেকেই আমার যা ঘুম পায়—তবে হ্যাঁ, আপনি সেদিন বলছিলেন না—যা শিখছি তা যদি মনের মত হয় মানে যদি আমরা জিনিষটাকে মনে ধরে রাখতে ইচ্ছে করি তবে তা মনে রাখতে পারি—কথাটা একদম সত্যি। আমি তো সেদিন হাতে নাতে প্রমাণ পেলাম।

সরমাদি হেসে বললেন—কি রকম?

—আমাদের সঙ্গে পড়ে অতুল, একদিনও ক্লাসে পড়া বলতে পারে না। অন্তর বর্ণনা শুরু হ'ল।—আসলে পড়া বলবে কি ও তো কিছু মনেই রাখতে পারে না। তা মাঝে একদিন স্কুলে গেছি ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতা দেখাতে, দেখা হ'ল অতুলের সঙ্গে, আরও সকলে ছিল। ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা ক্রিকেট-টেষ্টের গল্প করছি—আমাদের মধ্যে কে যেন বলল ইংল্যাণ্ডের বোথাম নাকি ফার্স্ট টেষ্টে দু'টো ইনিংস মিলিয়ে সাতটা উইকেট পেয়েছে। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন অতুল এগিয়ে এসে বলল—না ওটা সাতটা নয়, ন'টা। শুধু তাই না বোথাম গত বছরের জুবিলী টেষ্ট, আর এবারের ফার্স্ট টেষ্ট, সেকেণ্ড টেষ্টে মোট কত রাণ করেছে, আর কটা উইকেট নিয়েছে গড়গড় করে বলে গেল। পরে ভেবে দেখলাম—ক্রিকেটে হয়তো ওর ইণ্টারেস্ট খুব বেশী। তাই বোধহয় স্কোরবোর্ড ওর মুখস্থ হয়ে গেছে।

সরমাদি বললেন—দাঁড়াও তোমাকে আজ স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কয়েকটা কায়দা শিখিয়ে দিই।

অন্তু নড়েচড়ে বসল। সরমাদি শুরু করলেন।

—দেখ, স্মৃতিশক্তির সঙ্গে বুদ্ধির কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে। যার বুদ্ধি বেশী, তার যেমন কোন কিছু শেখার ক্ষমতা বেশী, তেমনি শেখা জিনিষ সে মনের মধ্যে ধরেও রাখতে পারে বেশী। তবে কোন কিছু শেখারও কতকগুলো কায়দা আছে যা জানলে—বুদ্ধি খুব প্রখর না হলেও শেখা জিনিষটাকে মনে বেশীদিন ধরে রাখা যায়। যেমন ধর, যখনই কোন কিছু পড়বে, সেটা আগে ভাল করে বুঝে নিয়ে তার

পর পড়বে। অনেকে দেখবে ইতিহাস মুখস্ত করার সময়—'আওরঙজেবের বাবার নাম ছিল সাজাহান, আওরঙজেবের বাবার নাম ছিল সাজাহান, আওরঙজেবের…' এইভাবে একটার পর একটা লাইন বারবার পড়ে মুখস্থ করে। এতে কিন্তু পড়াটা মনে থাকে কম। তার চেয়ে বরং যদি আওরঙজেবের জীবন, রাজ্যশাসন বা পতনের কারণগুলো প্রথমে ভাল করে বুঝে পড়ে নিয়ে, বই বন্ধ করে মনে মনে সেগুলোকে আউরে নেওয়া যায় অথবা খাতায় পয়েন্টস্‌গুলো লিখে ফেলা যায়—দেখবে অনেক জায়গা ঠিক মনে পড়ছে না। সেই জায়গাগুলো একবার দুবার পড়ে নিলে দেখবে পড়াটা খুব অল্প সময়ে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। ঠিক তেমনিই বীজগণিতের ফরমুলা মুখস্থ করবার আগে, সেটা কি করে তৈরী হ'ল তা যদি বুঝে নেওয়া যায় তবে দেখবে ফরমুলাটা মনে থাকবে অনেক বেশী।

—কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে এত না বুঝে টুঝে মুখস্থ করলেও তো দেখি, দিব্যি তা মনে থাকে! অন্তর গলায় বিস্ময়।

—কবিতার ব্যাপারটা আলাদা। সরমাদি উত্তর দিলেন। অনেক কবিতা বা ছড়ার তো কোন মানেই থাকে না। যেমন সেই কোন্ ছোটবেলায় পড়েছি—

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইট পাটকেল চিৎপটাং।
মুস্কিল আসান উড়ে মালি,
ধর্মতলায় কর্মখালি।

এ ছড়ার তো কোন মানেই হতে পারে না। তবু দেখ দিব্যি মনে আছে। আসলে একটা বিশেষ ছন্দে বারবার পড়তে পড়তে একসময় ছড়াটা ছবির মত হয়ে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। তবে হ্যাঁ, কবিতা মুখস্থ করতে বুদ্ধি বেশী না লাগলেও, একবার কবিতা মুখস্থ করার পর কিছুদিন বাদে বাদে যদি তা না ঝালান যায় তবে তা স্মৃতিভাণ্ডারে জমা থাকলেও প্রয়োজনের সময়ে খুঁজে পাবে না।

অন্ত চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। সরমাদি থামতেই বলে উঠল—এতো গেল পড়া মুখস্থ করার ব্যাপার। কিন্তু এমন তো হয়—রাস্তায় হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল। মুখটা খুব চেনা চেনা, কিন্তু কিছুতেই নামটা মনে করতে পারছি না।

—হ্যাঁ তা তো হয়ই। সরমাদি জবাব দিলেন। এক্ষেত্রে লোকটার মুখের ছবিটা তোমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে—হয়ত নামটা ভাল করে শোননি, অথবা তার নামটা এতই সাধারণ যে তোমার মনে দাগ কাটে নি। তাই লোকটার মুখ মনে পড়লেও, নামটা কিছুতেই মনে আসেনি। এখন থেকে যখনই কারোর সঙ্গে আলাপ হবে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দু'চারবার তার নামটা বলবে। যেমন ধর 'শ্যাম' বলে কারোর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তুমি বলবে—আচ্ছা শ্যামদা আপনি কোথায় থাকেন? শ্যামদা, আমাদের বাড়ী একদিন আসবেন, আজ চলি শ্যামদা'—এইরকম কয়েকবার বলার পরই দেখবে শ্যাম নামটা তোমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

অন্ত বলল—ভারী মজা তো!

সরমাদি বললেন—হ্যাঁ, মনে রাখার এমন মজার মজার অনেক কায়দা আছে। যেমন ধর কোন সংখ্যা মনে রাখতে হবে। তোমাকে একজনের বাড়ী যেতে হবে যার নম্বর ২১০/সি। একটু চিন্তা করে দেখলে তোমার মনে পড়বে, ২১০ হ'ল ৪২০'র অর্দ্ধেক। আজে বাজে লোকেদের আমরা "ফোর টুয়েন্টি" বলি। এদিকে তুমি আবার তোমার ক্লাসের 'সি' সেক্‌শনে পড়। এখন তুমি যদি 'ফোর টুয়েন্টি' আর তোমার 'সি-সেক্‌শন' মনে রাখতে পার, তবে ২১০/সি তোমার চট্ করে মনে পড়বে।

অন্ত হাসছিল। সরমাদি বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বারট্রাণ্ড রাসেলের নাম শুনেছ? একজন নাম করা দার্শনিক। একবার এক হোটেলে উনি ১৪১৪ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন। একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে যখন কিছু লোকের সঙ্গে উনি কথা বলছেন, একজন জিজ্ঞাসা করল—আপনার ঘরের নম্বরটা মনে আছে তো? রাসেল সাহেব হেসে বললেন—ওটা কি ভুল হয়। ২ এর বর্গমূলটা মনে রাখলেই তো হ'ল। আসলে ২ এর বর্গমূল হ'ল ১.৪১৪। 'দশমিক'টা সরিয়ে নিলেই তো ওটা ঘরের নম্বর হয়ে যাবে।

অন্ত হেসে বলল—দারুণ বুদ্ধি!

● অমিত চক্রবর্তী

ধারাবাহিক সায়েন্স ফিকশন

Endo Binder রচিত Adam Link's Vengeance গল্পের ছায়াবলম্বনে

রোব্বোস

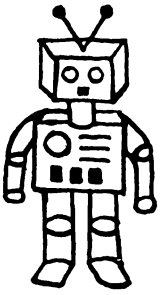

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

[**আগে যা ঘটেছে ঃ** একবিংশ শতকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক ডঃ অনুতোষ বোস তৈরী করলেন এক বিস্ময়কর যন্ত্রদানব, রোব্বোস—যে মানুষের মত চিন্তা ও অনুভব করতে পারে। রোব্বোসের অনুরোধে তাঁর একসময়ের সহকর্মী অসৎ বৈজ্ঞানিক ভবরঞ্জনের ল্যাবরেটরীতে বসে রোব্বোসের বন্ধু রোব্‌কেও তৈরী করলেন ডঃ বোস। কয়েকদিন ভবরঞ্জনের কাছে ওদের থাকতে অনুমতি দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। এবার ভবরঞ্জন রোব্বোস ও রোবের মস্তিষ্কে ভাইব্রেটার লাগিয়ে নিজের আবিষ্কৃত ট্রান্সমাইণ্ড টুপি পরে ওদের ওপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে ওদের মস্তিষ্কে ভাইব্রেটর এঁটে দিয়ে দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করার সুইচ লাগিয়ে ওদের ওপর প্রভুত্ব করার কাজ পাকা করল। এর পর সে ওদের নিয়ে গেল নিজের তৈরী অতিকায় মুণ্ডুহীন যন্ত্রমানবের কাছে। মাথা পালটিয়ে বিশাল দানব হল রোব্‌। তাকে গভীর রাতে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করতে পাঠাল ভবরঞ্জন। পরের দিন টি-ভি-তে খবর শুনে শঙ্কিত হয়ে অনুতোষ বোস লুনাকে নিয়ে ভবরঞ্জনের কাছে গেলেন। ওর নিয়ন্ত্রণে রোব্বোস জানান, সে ঠিক আছে! অনুতোষ বোস জানতে চাইলেন ভবরঞ্জনের মাথায় টুপি কেন।]

'এটা? কিচ্ছু না কিচ্ছু না'—সোডার বোতল খোলার মত ফ্যাঁস করে হেসে ফেলল ভবরঞ্জন, 'বলতে পারেন একটা বাঁদর-টুপি।'

লুনা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'বাঁদর-টুপি?'

'প্রায় তাই, তবে একটু উন্নত ধরণের আর কি!' ভবরঞ্জন হাসিটা চাপতে চাপতে বলল—'মানে, বুঝতেই পারছো লেডি বোস, মাথায় চুলটুল তো আমার তেমন—তার ওপর এই দারুণ ঠাণ্ডা, বেশ আরাম লাগে আর কি!'

'ওমা, তাই বুঝি?' লুনা এগিয়ে গেল—'একবার দেবেন? একটু পরে দেখবো!'

'পরে দেখবে? সেকি!' ভবরঞ্জন আমতা আমতা করতে লাগল, 'মানে তোমার তো আর আমার মত—'

'এ আবার কি ছেলেমানুষি, লুনা!' অনুতোষ বোস হাল্কা ধমক দিলেন—'এসব কিন্তু আমি একদম পছন্দ করি না!'

'আহা, তাতে কি হয়েছে—বাচ্চা তো—' দু-একবার ইতস্তত করে হেলমেটটা মাথা থেকে খুলে ফেলল ভবরঞ্জন। আর সঙ্গে সঙ্গে—

হ্যাঁ, চোখের পলক ফেলবার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা!

এই রকম একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল রোব্বোস। তার যান্ত্রিক মগজ বুঝতে পারছিল, এই শেষ সুযোগ! এটা হাত ছাড়া করলে তার আর কিছু করবার থাকবে না। কারণ, অন্তত এই মুহূর্তের জন্যে সে মুক্ত। তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে একটি থাবায় হেলমেটটা সে ছিটকে ফেলে দিল মেঝেয়, তারপর দু-হাতে চেপে ধরল ভবরঞ্জনের গলা।

সমস্ত ব্যাপারটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলবারই অবকাশ পেলেন না অনুতোষ বোস, বিহ্বল ভাবটা কেটে যেতেই চীৎকার করে উঠলেন—'রোব্বোস, ছেড়ে দাও—উনি মরে যাবেন—'

কথাটা মাথায় গিয়ে ঘা মারল রোব্বোসের। না, উনি যাই করে থাকুন, নিজের হাতে কোন মানুষের জীবন নেওয়াটা তার পক্ষে ঠিক হবে না—মানুষই যে তাকে সৃষ্টি করেছে। রাগে আসলে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। একটুও দেরি না করে গলাটা ছেড়ে দিল রোব্বোস।

আতঙ্কে নীল হয়ে গিয়েছিল ভবরঞ্জন। এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দম বন্ধ হবার কথা নয়—কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কাতেই বোধহয় তার শরীর এলিয়ে পড়েছিল, আস্তে আস্তে তার অসাড় দেহটা চেয়ারে বসিয়ে দিল রোব্বোস।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না'—ডঃ বোসের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কি হয়েছে কি, রোব্বোস?'

'বলছি—সব বলবো!' রোব্বোস প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, যদিও তার যান্ত্রিক মুখে তা প্রকাশ পাচ্ছিল না, বললে, 'আগে একটা কাজ করুন, আমার মস্তিষ্কের ঠিক পেছনের পাতটা খুলে ফেলুন।'

'কি বলছো?'

'দেরি করবেন না, ওঁকে বিশ্বাস নেই। দেখবেন মস্তিষ্কের ঠিক নীচেই ওয়েল্ডিং করে লাগানো আছে একটা সূক্ষ্ম ভাইব্রেটর। ওই কোণে অ্যাসিডের বোতল আছে, ওটা দিয়ে জোড়টা গলিয়ে তাড়াতাড়ি ভাইব্রেটর খুলে ফেলুন।'

এতক্ষণ যে ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছিল, ভাইব্রেটরের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা জলের মত সহজ হয়ে গেল অনুতোষ বোসের কাছে। হেলমেটটা ট্রান্স-মাইণ্ড টুপি, এ সন্দেহ তাঁর আগেই হয়েছিল, কেবল রোব্বোসের যান্ত্রিক মগজ কি করে তা নিয়ন্ত্রণ করছে—এই ছিল সমস্যা। এখন সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে অপরিষ্কার আর কিছু নেই।

সন্তর্পণে অ্যাসিডের বোতল হাতে এগিয়ে গেলেন অনুতোষ বোস, খুলে ফেললেন মাথার পেছনের পাত।

খানিকটা দুর্ভাবনা গেল। ওয়েল্ডিং খুব নিপুণ হাতেই করা হয়েছে। ইরিডিয়াম স্পঞ্জ মস্তিষ্ক একেবারে অক্ষত আছে। কিন্তু ভাইব্রেটর খোলার ব্যাপারটাও সহজ নয়—সামান্য এ্যাসিড ছিটকে পড়লেই মস্তিষ্কের দারুণ ক্ষতি হতে পারে।

অত্যন্ত সাবধানে ভাইব্রেটর খুলে নিলেন ডঃ বোস। পাতটা জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

এতক্ষণে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত মনে হল রোব্বোসের। সে লুনার দিকে তাকাল। মস্তিষ্কের মধ্যে একটা অব্যক্ত অনুভূতি জেগে উঠছে—তা বেদনার না আনন্দের, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। কেবল চোখের ধাতব পাতাদুটো যেন ওজনের চেয়ে ভারী হয়ে নেমে আসতে চাইছে নীচে।

'রোব্বোস!' এতক্ষণ বিহ্বল হয়ে সব কিছু দেখছিল, এবার এগিয়ে এসে ওর একটা হাত চেপে ধরল লুনা—'রোব্বোস, তুমি ঠিক আছো তো?'

রোব্বোস কথা বলতে পারছিল না, অন্য হাতটা আলতো করে লুনার পিঠে বোলাল।

'কি হয়েছিল তোমার রোব্বোস? ওই লোকটা কি করে তোমায় আটকে রেখেছিল?'

'ওই যে, যেটা এক্ষুনি আমার মাথা থেকে খুলে নেওয়া হল'—রোব্বোস বলল, 'ওটা দিয়ে উনি

আমাদের একেবারে চাকর তৈরি করে রেখেছিলেন, আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারতাম না, কাজ করতে পারতাম না—উনি যা বলতেন তাই করতাম।

'কি সাংঘাতিক!' লুনা ভবরঞ্জনের চেয়ারের দিকে তাকাল। ভবরঞ্জনের জ্ঞান তখন ফিরে এসেছে, কিন্তু শরীর তেমনি এলিয়ে আছে। একবার শুধু চোখ পিট পিট করল, ঠোঁট নড়ল না। লুনা ছল ছল চোখে রোব্বোসের দিকে ফিরে বলল—'এই রকম করেই কি ও তোমাকে দিয়ে ব্যাঙ্কে ডাকাতি করিয়েছে?'

'না, আমাকে দিয়ে নয়, রোব্‌কে দিয়ে।'

'কেন?' অনুতোষ বোস মুখ তুললেন—'তোমাকে ছেড়ে হঠাৎ রোব্‌কে বেছে নেবার কারণ?'

'ঠিক জানি না, বোধহয় রোবের যান্ত্রিক শক্তি আমার চেয়ে অনেক বেশী বলেই ওকে পাঠিয়ে ছিলেন।'

'সেকি'—অনুতোষ বোস অবাক হলেন, 'সেরকম হবার তো কোন কারণ নেই।'

রোব্বোস একবার ভবরঞ্জনের ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, 'রোবের যে দেহটা আমি তৈরি করেছিলাম সেটা আর এখন তার নেই—উনি নিজে আমার থেকে প্রায় দেড়গুণ বড় একটা রোবট তৈরি করেছিলেন, আমি বাধ্য হয়ে রোবের মস্তিষ্ক তার মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছিলাম।'

'চমৎকার!' অনুতোষ বোস বিরক্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন ভবরঞ্জনের দিকে—'এমন একটা মাথা কেবল শয়তানি বুদ্ধিতেই কাজে লাগল!'

লুনা ওর দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'রোব্বোস ওর ঘাড়টা মুটকে দিচ্ছিল, সেই ভাল ছিল—তুমি কেন ওকে বারণ করতে গেলে

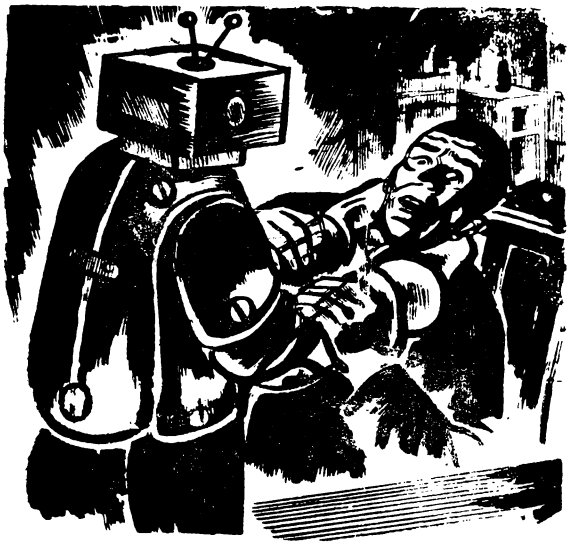

রোব্বোস·····দুহাতে চেপে ধরল ভবরঞ্জনের গলা।···

দাদু?'

অনুতোষ বোস কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাইরে একটা ধাতব শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

রোব্বোসের শরীর উৎসাহে একটা মোচড় খেল। 'রোব্‌ এসেছে'—ফিসফিস করে বলে ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সেখান থেকেই চীৎকার করে বলল, 'রোব্‌, আর ভয় নেই—এখন আমরা মুক্ত।'

'সত্যি?' রোব্‌ প্রথমটা কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপরই মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আনন্দের ধ্বনি উচ্চারণ করে রোব্বোসকে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই কি যে ঘটল, রোব্বোস কিছুই বুঝতে পারল না—কেমন যেন কেঁপে উঠল রোবের শরীর, তারপরই তার প্রচণ্ড এক ধাক্কায় রোব্বোস ছিটকে গিয়ে পড়ল

মেঝেয়।

অবাক হয়ে ঘরের দিকে তাকাতেই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল তার।

ছি ছি—কি নির্বোধের মত কাজ করেছে সে! হেলমেটটা তখনই যদি পা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিত!

কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই! ভবরঞ্জন এখন টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে, হেলমেটটা কোন ফাঁকে মাথায় পরে নিয়েছে কে জানে! তার মানে, রোব্ আবার চলে গিয়েছে তার হাতের মুঠোয়। ডঃ বোস একবার চেষ্টা করলেন কিছু বলবার, ভবরঞ্জন ধূর্ত শিয়ালের মত হেসে উঠল—রোবেবাস দেখতে পাচ্ছে। অকস্মাৎ লুনার মুখটা এক পলকের মধ্যে কেমন যেন রক্তশূন্য হয়ে গেল, ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

চমকে ঘাড় ফেরাল রোবেবাস। যা দেখল তাতে যেন দ্বিগুণ শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ আছড়ে পড়ল তার মস্তিষ্কে!

প্রায় পাঁচশো পাউণ্ডের বিশাল যন্ত্রদানব ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার বুকের ওপর!

[চলবে]

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তির রেকর্ড করতে ইচ্ছুক শিল্পীরা যোগাযোগ করুন।

রেডিও ও পেপার পাবলিসিটির সুযোগ আছে।

মেলোডিকা রেকর্ডস
১/৬৪ বিবেকনগর
যাদবপুর, কলি-৭৫

জানো কি?

১। যে যন্ত্রের সাহায্যে দুটো বা দুটোর বেশী আলোক উৎসের আলোক-প্রাবল্য তুলনামূলক ভাবে বা'র করা যায় তার নাম কি?
ক) রেডিওমিটার খ) ফটোমিটার গ) পাইরোমিটার।

২। গ্রহগতির সূত্রাবলী (Laws of planetary motion) কার আবিষ্কার?
ক) কেপলার খ) আর্যভট গ) কোপারনিকাস।

৩। সৌর জগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ কোন্‌টি!
ক) টাইটান খ) চাঁদ গ) গ্যালিমিড।

৪। সৌর জগতের সবচেয়ে ছোট উপগ্রহ কোন্‌টি?
ক) চাঁদ খ) আইও গ) জুপিটার-১৪।

৫। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে পেট্রল এবং বাতাসের সংমিশ্রণ ঘটায় যে যন্ত্রাংশ তার নাম কি?
ক) সাইলেন্সার খ) কারবুরেটর গ) রেডিয়েটর।

৬। কোন্ অভয়ারণ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত?
ক) কাজিরঙ্গা খ) জলদাপাড়া গ) নন্দন কানন।

৭। গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিড আনুমানিক কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন?
ক) খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বছর খ) খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বছর গ) ১০০ খ্রীষ্টাব্দ।

৮। পৃথিবীর চৌম্বকত্ব কে প্রথম ধরতে পারেন?
ক) উইলিয়াম গিলবার্ট খ) নিউটন গ) মাইকেল ফ্যারাডে।

জানো কি'র উত্তর

১। খ ২। ক ৩। ক ৪। গ
৫। খ ৬। খ ৭। ক ৮। ক

শীতের মরশুমে খাওয়া-দাওয়া

অমিয়কুমার হাটি

কথা উঠতে পারে, আমাদের দেশে বেশির ভাগ সংসারে যেখানে বারোমাসই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে শীতের মরশুমে খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ফিরিস্তি দেওয়ায় লাভটা কী? তবে একটু তলিয়ে যদি দেখি, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে অন্যরকম। আমেরিকা তো ধনী দেশ। ওখানকার খাবারের বাজারে দশ হাজারের বেশি ধরণের খাবার জিনিস সাজানো থাকে থরে বিথরে—তাহলেও সেখানে যারা খেতে পায়, তাদের মধ্যেও রক্তাল্পতা দাঁতের অসুখ, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-সি,—এসবে অভাবজনিত অসুখ, আমিষের অভাব জনিত অপুষ্টি, গলগণ্ড, বয়স অনুপাতে ঠিকমত বেড়ে না ওঠা—এগুলো বেশ দেখা যায়। অভাবের থেকে স্বভাবই হয় দায়ী—আর খাওয়ার স্বভাব বদলানো—সে কি সহজ খুব? ধরো না ভাতের ফ্যান ফেলে দেবার কথা। ঐ ফ্যানের সঙ্গে কত ভিটামিনই তো আমরা ফেলে দিই—কাঁচা শাকপাতার উপরও অবহেলা কারুর কারুর—যাতে থাকে, ক্যালসিয়াম। অথচ শীতের মরশুমে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ইঞ্জেকসন নিতে ছোটেন বহুলোকে শরীর ভাল রাখার তাগিদে।

বেঁচে থাকতে হলে শ্বাস প্রশ্বাসের বাতাস এবং খাবার জলের পরেই খাদ্য দ্রব্যের স্থান। আর খাওয়ার সঙ্গে যোগ তো আছেই রঙের, গন্ধের, খাবারটা গরম না ঠাণ্ডা তারও। মোলায়েম না তন্তুময়, নরম না মুচমুচে, ক্রীমের মতো না তেলেতেলে, ভেজা না শুকনো, মিষ্টি, তেঁতো, লবণাক্ত, টক বা মেশানো স্বাদ এসব মিলিয়েই লোক বিশেষের খাবার রুচি হয় বা হয় না। খাবার যে শুধু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যেই দরকার তাই নয়, সামাজিকভাবে আমাদের ভাল থাকা না থাকা, ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভাল ও খুশি থাকা না থাকা, এমনকি আমাদের আবেগও অনেকখানি নির্ভর করে খাবার দাবারের উপর। কী ধরণের জীবনযাপন আমরা করি এবং আমাদের প্রিয়জনের ও আশেপাশের লোকেদের উপর কী আমাদের অনুভূতি—তারও প্রতিফলন ঘটে খাবার দাবারের মধ্যে।

পরিবেশ, মন, মেজাজ এবং সবশেষে ঋতু—আদিকাল

থেকে এ সবই প্রভাব ফেলেছে খাবার দাবারের উপর। আর ঋতুগুলোর মধ্যে শীত যেন সবচেয়ে বেশি সমারোহ নিয়ে আসে ভোজনরসিকদের কাছে। বনভোজনের তাই তো এত আয়োজন এই সময়ে। শীতের রাত বেশ বড়—হজমও হয় ভাল, তাই ক্ষিধেও হয় বেশী। শীতে কাজের ক্ষমতা বাড়ে।

টেনেটুনে নিলে শীতের মরশুমটা বেশ বড়ই। কালীপূজার সময় থেকে শীতের আমেজ—শেষ রেশ থাকে সরস্বতী পূজার পরও। কালীপূজার আগের দিন কৃষ্ণাচতুর্দশীতে রেওয়াজ আছে ১৪ শাক খাবার। মাঝে নানা উৎসব।

বলার মতো হল নবান্ন—নতুন ধানই শুধু নয়—কত কী আয়োজন হয়, কোথাও কোথাও ১৯ বা ২১টি ভাজা খেতেই হয় নবান্নতে—ছট পূজাতেও দেখতে পাওয়া যায় আখ ইত্যাদি নিয়ে যেতে, ইতু পাতা হয়, শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে শীতের দিনে পিঠে পুলি উপভোগ করতে কোন বাঙালীর প্রাণ না চায়? বড়দিনে কেক পৌঁছে যায় এখন শহুরে মানুষদের ঘরে ঘরে। সরস্বতী পূজার পরদিন গোটা সেদ্ধ খান অনেকে—থাকে গোটামুগ, কলাই, জোড়া সাদা সীম, সাদা বেগুন, আরও কত কী! সাদার মাহাত্ম্য কী জানিনা তবে খাবারগুলোর কোনটাই ফেলনা নয়।

শীতের প্রকৃতিও যেন ভোজনরসিক মানুষের এই সমারোহে যোগ দিতে চায়—যোগান দেয় যেন অফুরান সব খাবার—শাকের মধ্যে পালং, পুনকো, সরষে, পুদিনা, ধনে, পেঁয়াজকলি, লেটুস প্রভৃতি; তরিতরকারীর মধ্যে বীট, গাজর, সীম, মাখনসীম, মান, ওল, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলো, বেগুন, লাউ, নতুন আলু প্রভৃতি; টকের মধ্যে টমাটো, কাঁচা তেঁতুল জলপাই, স্কোয়াস প্রভৃতি; ফলের মধ্যে কমলা, রাঙালু, শাঁক আলু, মটরশুঁটি, নানান ধরণের রসালো কুল প্রভৃতি—। ওঠে নতুন চাল, সেদ্ধ হয় তাড়াতাড়ি, তবে হজম করতে একটু সময় লাগে। শীতের সময়েই ডাল ভিজিয়ে বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ। পিঠে পুলির যেটা সব থেকে মুখরোচক সেটা হল নলেন গুড়। শুধুই বা মিষ্টি, পায়স প্রভৃতির সঙ্গে রঙ, স্বাদ ও গন্ধে অপরূপ তো বটেই, ডায়াবেটিস না থাকলে খাদ্যগুণ ও পুষ্টির দিক থেকে সেরা। আর শীতের সকালে প্রকৃতির নিজস্ব হিমঘর থেকে বের করা টাটকা, ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ, মিষ্টি খেজুর রসের তুলনা কোথায়? তার কাছে দাঁড়াতে পারে খানিকটা স্যাকারিন আর এ্যাসপিরিন মিশিয়ে তৈরি বোতলের সোডা, লেমনেড? শীতের দিনে, বলে রাখি, ঠাণ্ডা ডাবের জলও অপূর্ব তৃপ্তিদায়ক।

এই যে খাবার দাবারের দীর্ঘ মিছিল, চুলচেরা বিচার না করেও বলা যায়, এই মিছিলে সামিল আছে প্রায় সব রকম ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, ট্রেস এলিমেন্টস, খাদ্যপ্রাণ ও পুষ্টিদায়ক শর্করা, স্নেহ ও আমিষ জাতীয় বস্তু। এরা রসনা জাগায়। এরা চিত্তগ্রাহী। ওদিক থেকেও এদের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে। কপি, মূলো, পালং বা লেটুস—এতে ভিটামিন ছাড়াও আছে খাদ্যদ্রব্য, ক্যালসিয়াম, কিছু লোহা এবং অন্যান্য ট্রেস এলিমেন্টস যা শরীরে বিশেষ দরকারে লাগে। এই মিছিলের সব কিছুই সবার নাগালের বাইরে নয়। তবে, টানাপোড়েন যেখানে চরম, সেখানে ডাল ভাত যা জোটে তাই সই, সেখানে শীত ও গ্রীষ্ম সমান।

আবার, এতসব খাবারের মধ্যে সবার সবকিছু হয়ত ভাল লাগে না। কারুর কাঁচা মূলো খেতে ভাল লাগে, কেউ লেটুস পাতা কাঁচা না খেয়ে শাক রেঁধে খান। পুদিনা বা ধনে পাতার বেলাতেও তাই—যদিও যে কোন ব্যঞ্জনে মা-দিদির হাতের ছোঁয়ায় ধনে পাতাই এনে দিতে পারে অপূর্ব স্বাদ। অত দূরেই বা যাই কেন, হিসাব যদি করি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি কার কতটুকু আছে, তাহলে নামে তুচ্ছ বেগুনই বা কম কীসে? বেগুন ভাজা দিয়েই তো শীতের নেমন্তন্নের বাড়ীতে খাওয়া শুরু হয় আর একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে শীতের সকালে দু এক কুচি কাঁচা লঙ্কা ও পেঁয়াজ মেশানো বেগুনপোড়ার সঙ্গে মুড়ি—তাই কী কম মুখরোচক!

আমাদের বইপত্তর···

অ্যাডভেঞ্চার, ইতিহাস আর চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে লেখা মনোজ্ঞ কিশোর মনের উপযোগী গল্প সম্ভার

অমলেন্দ্রনাথ ঘটকের

পটলচাঁদের গল্প (৬·০০)

এছাড়া

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস 'অচিন পাখীর সুর'। (১২·০০)

পিনাকরুদ্র সেনের উপন্যাস 'কেকার সঙ্গে একা' (৮·০০)

সত্যেন্দ্র আচার্যের গোয়েন্দা 'কাহিনী তিনমূর্তি আতঙ্ক' (১২·০০)

সমীর ঘোষের গল্প সংকলন 'জীবনতীর্থ' (৮·০০)

জয়মালা / ২৯/২ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

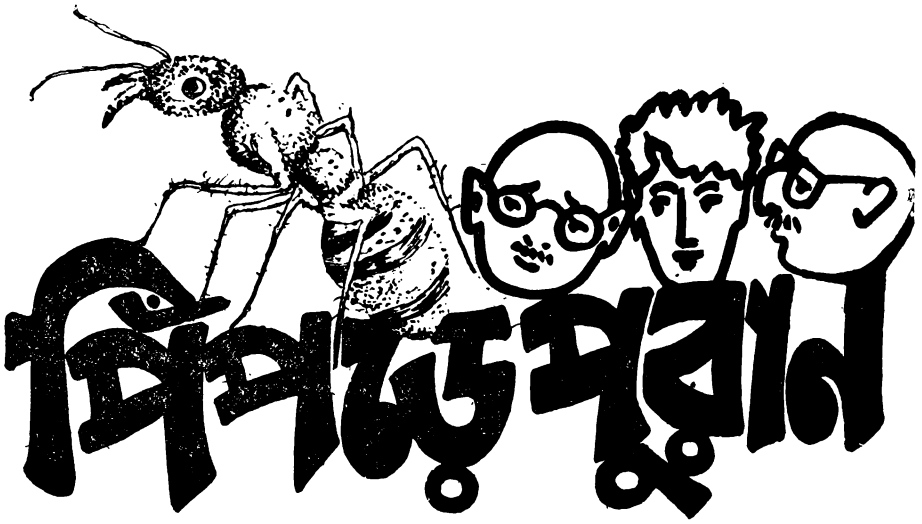

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল—তারপরই ছ'ফুট লম্বা পিঁপড়েরা আন্দিজ পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে ওখানকার মানুষদের তাড়ায়। প্রথম আক্রমণ হয় ৭৭৫৭ সালে। ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিটিউডের পশ্চিম ধারে দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান শহরগুলো হঠাৎ একদিনে ধ্বসে পড়ে। বাকী সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা প্রাণপণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। পিঁপড়েদের শেষ আক্রমণের কথা জানা যায় সেনর সাবাটিনির লেখা থেকে।]

সেনর সাবাটিনি লিখেছেন—"হঠাৎ গভীর-রাত্রে শহরের পশ্চিম-ধারের প্রাচীরের প্রহরীরা সংবাদ দিলে যে, দূরে লাখ-লাখ পিঁপড়ে এসে জড়ো হয়েছে। প্রস্তুত আমরা দিনরাতই থাকতাম। সুতরাং এ-সংবাদে আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না বরং এতদিন বাদে সামনা-সামনি যুঝতে পারবো বলে আমরাও উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের প্রাচীরের সমস্ত সার্চলাইট তখন রাত্রিকে দিন ক'রে তুলেছে। সেনাপতির আদেশে অন্য সমস্ত দিকে কয়েকজন প্রহরী ও সৈন্য ছাড়া আমরা সকলে পশ্চিমে নগর-প্রাকারের বাইরে এসে জড়ো হলাম।

সেখানে যে-দৃশ্য আমরা দেখলাম, তা জীবনে ভোলবার নয়। অন্ধকার রাত্রি আমাদের অসংখ্য সার্চলাইটের প্রখর আলোয় তিন-মাইল পর্যন্ত একেবারে যেন পেছিয়ে গেছে। সেই আলোয় আমাদের শহর থেকে দু'মাইল দূরে অসংখ্য পিঁপড়ের বাহিনী কালো-সমুদ্রের বন্যার মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিঁপড়ের সারের পর পিঁপড়ের সার—যতদূর আলো পৌঁছোয়, ততদূর পর্যন্ত শুধু পিঁপড়ের সমুদ্র!

সেনাপতির আদেশে আমাদের একহাজার কামান গর্জন ক'রে উঠলো। ঘন পিঁপড়ের সারের মধ্যে আমাদের কামানের গোলায় যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হলো, তা বর্ণনা করা যায় না। দিকে-দিকে আমাদের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়েও কিন্তু পিঁপড়েরা থামল না। মড়া পিঁপড়ের স্তূপের ওপর নিয়ে নতুন পিঁপড়ের দল সমানভাবে অগ্রসর হতে লাগলো।

পিঁপড়েরা আমাদের গোলার জবাব দেয় না, শুধু নিঃশব্দে অগ্রসর হয়। সেনাপতির আদেশে এবার আমরা অগ্রসর হলাম। প্রথমে বিষাক্ত-গ্যাস

নিয়ে একদল, তার পিছু-পিছু আমাদের আটশত ট্যাঙ্ক। প্রাচীর থেকে সার্চলাইট নামিয়ে বড়-বড় গাড়ির ওপর তুলে সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

পিঁপড়েদের দিক থেকে তবুও কোনো জবাব নেই। শুধু তারা ধীরে ধীরে এগোয়।

সেনাপতি আদেশ দিলেন—'বিষাক্ত-গ্যাস ছাড়ো।'

বিষাক্ত-গ্যাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পিঁপড়েদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হলো। সে-গ্যাসে এবং আমাদের ট্যাঙ্কগুলির মেশিনগানের গুলিতে লাখো-লাখো পিঁপড়ে মারা গেল। যেদিকে বিষাক্ত গ্যাস ছোঁড়া হয়, সেদিকে পিঁপড়ের সার যেন কে মুছে দেয়। শুধু মাটি কালো ক'রে অসংখ্য পিঁপড়ের মৃতদেহ পড়ে থাকে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলি সেই মরা-পিঁপড়ের সার মাড়িয়ে অগ্রসর হয়; আর তাদের মেশিনগানের গুলিতে পিঁপড়ের দল ছারখার হয়ে যায়। পিঁপড়েদের এই দুরাবস্থায় তখন আমরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। শহর থেকে ছেলে, মেয়ে, বুড়োরা পর্যন্ত তখন পিঁপড়েদের ধ্বংস-যজ্ঞ দেখবার জন্যে প্রাচীরের বাইরে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েরা হঠাৎ যখন পিছু হটতে আরম্ভ করল, তখন তাদের অর্ধেকের বেশি মারা পড়েছে। কিন্তু পেছুলে কি হবে? আমাদের ট্যাঙ্কগুলি তখন একেবারে তাদের ভেতর গিয়ে পড়েছে। সেই বিরাট ট্যাঙ্কগুলির চাপেই যে কত পিঁপড়ে মারা গেল, তার ঠিক নেই।

আমার তখন মনে হচ্ছিল, এতদিন আমরা মিথ্যাই ভয় পেয়েছি। হয়তো কোনো উপায়ে তারা কিছু শক্তি অর্জন করেছে; কিন্তু হাজার হ'লেও তারা কীট—সামান্য কীট মাত্র। মানুষের শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কৌশলের বিরুদ্ধে তারা লড়তে আসে কোন্ সাহসে? তাদের এই দুর্দশায় একটু যেন করুণাই আমার হচ্ছিল। সেনাপতির আদেশে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাদের ভেতর গিয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধটা আমার বীভৎস প্রহসনের মতো লাগছিল। অসহায় পিঁপড়ের দলের পিছু হাঁটবার ব্যর্থ-চেষ্টা দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ছিন্নভিন্ন হয়ে পিছু হাঁটলেও তারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নি।

এবার সেনাপতির আদেশে পদাতিক দল অগ্রসর হলো। সেনাপতির আদেশ—একটি পিঁপড়েও যেন আজ না বাঁচে। কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হতে না হতেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিঁপড়ে-বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ'-পাঁচেক সার্চলাইট জ্বলে উঠেছে। পিঁপড়েদেরও যে সার্চলাইট থাকতে পারে এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কি প্রয়োজন, ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সার্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চলাইটের আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সব্জে রঙের। সে তীব্র আলোর সরু-জিহ্বা যেন তারা আমাদের আগের সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সারের পর সার সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে সে-আলো বুলিয়ে-বুলিয়ে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নিচু হয়ে বসে সেটা বেঁধে উঠে আমি দেখি যে, সে-আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের মুখের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। [চলবে]

বিজ্ঞানী

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী

বরাহমিহির

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আমাদের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে যে কজন বিজ্ঞানীর নাম বিশেষ গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বরাহমিহির নামটি তাদের মধ্যে অন্যতম। খ্রীস্টের আবির্ভাবের পূর্বে রোমে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ প্রণেতা যেমন ছিলেন প্লিনি, তেমনই খ্রীস্টের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে বরাহমিহিরের কথা বলা চলে। বরাহ মিহিরের জ্ঞান ছিল ব্যাপক। বিজ্ঞানের সব বিষয়েই তাঁর মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, মাণিক্যবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সব বিষয়ে তিনি গ্রন্থও রচনা করেন। কিন্তু তাঁর প্রণীত গ্রন্থে ভার যতটা আছে, ধার ততটা দেখা যায় না।

গণিত এবং জ্যোতিষ প্রসঙ্গেই বরাহমিহিরের নাম উল্লেখ করা হয় সকলের আগে। দুটি বিষয়েই মৌলিক অবদান তাঁর তেমন কিছু নেই। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তাঁর রচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

জ্যোতিষে বরাহমিহিরের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা। এটির মধ্যে তিনি পাঁচখানি ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের সার সংকলন করেন। প্রাচীন এই সব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রধানত বরাহমিহিরের লেখা থেকে সংগ্রহ করা। তাঁরই কল্যাণে আমাদের জ্যোতিষের প্রাচীনতম অংশগুলি রক্ষা পেয়েছে।

বরাহমিহির তাঁর আগেকার অনেক জ্যোতি-র্বিদের কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ্ আর্যভট আর তাঁর শিষ্য লাটদেব সম্পর্কে তো বটেই, তা ছাড়া সিংহাচার্য, প্রদ্যুম্ন, বিজয় নন্দীর মত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হিন্দু জ্যোতির্বিদের কার্যকলাপের উল্লেখও আমরা প্রথম তাঁর রচনায় পাই।

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ছাড়া বরাহমিহিরের আরও দুটি উল্লেখ করবার মত গ্রন্থ আছে। এর একটি বৃহজ্জাতক অন্যটি বৃহৎসংহিতা।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রখর মনীষাসম্পন্ন এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় কি? প্রাচীন কালের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতারা প্রণীত গ্রন্থের ভেতরেই নিজেদের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস। কাপিত্থ নামক জায়গায় ইনি সূর্যদেবকে প্রসন্ন করে বর লাভ করেন। তিনি অবন্তীনগর নিবাসী ছিলেন। বরাহমিহিরের আবির্ভাবকাল নিয়ে অবশ্য ঐতি-হাসিকদের মধ্যে কিছুটা বিতর্ক আছে। কিন্তু তিনি যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের কোনো সংশয় নেই।

বরাহমিহির নিজের প্রখর মনীষা সত্ত্বেও তাঁর প্রায় সমসাময়িক কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভটের ভূ-ভ্রমণবাদ মেনে নিতে পারেননি। গ্যালিলিও, কোপারনিকাসের মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের জন্মের অনেক আগে পৃথিবীর গতি সম্পর্কে আর্যভট যে যথার্থ মতবাদ তুলে ধরেন, তার এক বিরুদ্ধ গোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বরাহমিহিরই ছিলেন প্রবীন। কৌতুককর যুক্তিতে তিনি বলেন, 'কেউ কেউ মনে

করেন যে পৃথিবী যেন একটি ভূ-চক্রে স্থাপিত অবস্থায় আবর্তনরত। যদি তা হতো, তা হলে পক্ষী প্রভৃতি উড্ডীয়মান হয়ে কুলায় প্রত্যাবর্তন করতে পারত না।'

গণিতে ররাহমিহিরের সময়ে যে শূন্যের বিশেষ ব্যবহার ঘটেছিল, তার পরিচয় তাঁর একাধিক গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বরাহমিহির বারবার শূন্যের উল্লেখ করেন।

মানুষের উপরে গ্রহের নানা রকম দুষ্ট প্রভাব আছে, আমরা অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করি। এই দুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তির জন্যে দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান প্রস্তর, মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতির ব্যবহার সুপ্রাচীন। বরাহমিহির বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর যেমন, মণি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদির বাহ্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। নানা ধরণের রঞ্জকদ্রব্য—বকুল, চাঁপা প্রভৃতি ফুলের গন্ধ ছড়ায়—কৃত্রিম উপায়ে তৈরি এমন সব সুগন্ধি, লোহার মত উন্নত এমন ধাতু নিষ্কাশন সম্বন্ধেও বৃহৎ-সংহিতায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শুনলে অবাক হওয়ার কথা—বরাহমিহির বজ্রলেপ নামে এক ধরণের সিমেন্টের উল্লেখ করেন। এই গুঁড়োর বাঁধন-শক্তি বজ্রের মত কঠিন আর মন্দির প্রভৃতির নির্মাণকার্যে প্রাচীনকালে এটি আমাদের দেশে ব্যবহার করা হতো।

প্রধানতঃ বিশ্বকোষ প্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বরাহমিহিরের—তাঁর সমকালে বিজ্ঞানচর্চা এবং পূর্ব-কালের অনেক গ্রন্থের পরিচয় তাঁর কল্যাণেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

With compliments from :

A WELL WISHER

নিজে করো

ক্লাশে মাষ্টার মশাই যখন ভৌতবিজ্ঞান বা জীবনবিজ্ঞান পড়ান তখন যদি ছোট ছোট পরীক্ষা তোমাদের সামনে করে দেখান তাহলে তোমাদের খুব মজা লাগে তাই না?

বিজ্ঞানের যেসব ফরমুলা মুখস্থ করতে তোমরা হিমসিম খেয়ে যাও, কিংবা কোন যন্ত্রপাতির ছবি আঁকতে গিয়ে পরীক্ষার খাতায় হাবুডুবু খাও তাদের কাছে সহজ পথ হোলো ছোট ছোট মডেল তৈরী করার চেষ্টা করা। তোমার বিজ্ঞান বইয়ের পাতা থেকেই মডেল বাছতে পারবে, তোমার স্কুলের বা বাড়ীর মাষ্টার মশাইকে বললেই তোমাদের দেখিয়ে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। এবার থেকে এই বিভাগে এই রকম কিছু মডেল তোমরা পাবে যা তোমরা নিজেরাই ঘরে বসে বানাতে পারবে। প্রথমেই বলি, মডেল দু ধরণের হতে পারে, কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রকে সহজভাবে প্রমাণ করার জন্য ছোটখাটো জিনিস দিয়ে কোন উৎপাদনপ্রণালী অথবা বড় একটা যন্ত্রের ক্ষুদে ছাঁচ। যারা হাতে কলমে কাজ করতে ভালোবাসে তারা ইচ্ছে করলে বাড়ীতে একটা ছোট্ট টেবিলে কতগুলো জিনিস সাজিয়ে মডেলের একটা মিনি কারখানা তৈরী করতে পারো। খুব বেশী দামী জিনিস সব সময় দরকার নেই। যেমন ধর, তোমার টেবিলে কিছু টেষ্ট টিউব, বীকার, পিচবোর্ড, গালা, পিন, ড্রয়িং পিন, টর্চের ব্যাটারী, ছুরি কাঁচি, এছাড়া ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রির কিছু কিছু ছোটখাটো সস্তা যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য; তোমার টেবিলের কাছাকাছি একটা জলের কল থাকলে ভালো হয়। আজকে তোমাদের যে মডেলটির কথা বলব সেটা খুব সহজেই যে কেউ করে ফেলতে পারো। বিড়লা মিউজিয়ামের হবি সেন্টারের **হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের** করা এই মডেলটি ১৯৭৯ সালে পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান শিবিরে পুরস্কৃত হয়।

তোমরা জানো বিভিন্ন কোণের sine ও cosine-এর মান অঙ্ক বইয়ের পেছনে লগ টেবিলের সাথে দেওয়া থাকে। হিরণ্ময়ের মডেলের সাহায্যে 90° পর্যন্ত যে কোন কোণের sine বা cosineর মান সহজেই পড়ে নেওয়া যাবে। একটা প্লাষ্টিক জাতীয় জিনিসের চাকতির ওপরে 0°—90° দাগ কাটা থাকে। তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ বৃত্তাকারে চাকতিটির ব্যাসার্ধ বরাবর দাগ কাটা আছে (mm), এও দেখতে পাচ্ছ চলমান বাহুটির সাথে একটি চলমান স্কেল লাগানো আছে, ধর তুমি 55° কোণের sine ও cosine-এর মান জানতে চাও। সেক্ষেত্রে চলমান বাহুটির একটি প্রান্ত 55°তে স্পর্শ করাও। যখন চলমান বাহুটির মাঝামাঝি রেখাটি 55°তে স্পর্শ করবে, সেই অবস্থায় স্কেল ও ব্যাসার্ধের মানটা দেখে নাও। চলমান বাহুটির দৈর্ঘ্য তোমায় আগেভাগেই জেনে রাখতে হবে। বলা বাহুল্য চলমান বাহু, স্কেল ও চাকতির ব্যাসার্ধ মিলে একটি

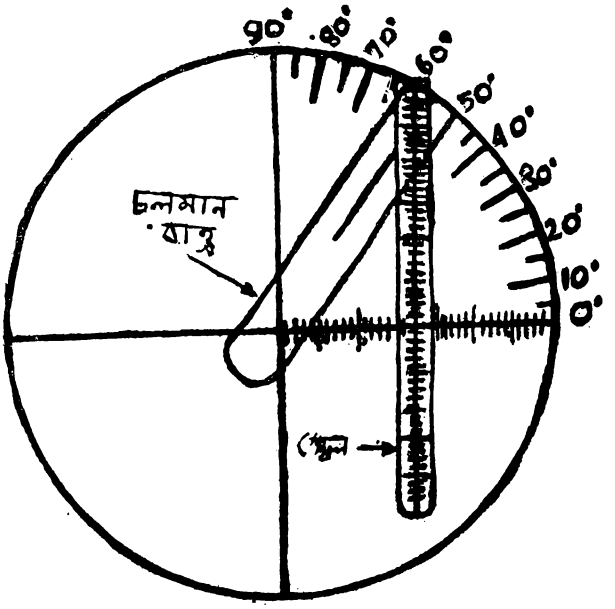

সমকোণী ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজের ব্যাসার্ধটি লম্ব, স্কেল ভূমি এবং চলমান বাহুটি অতিভুজ। যেহেতু কোন কোণের sineর মান লম্ব / অতিভুজ ও cosineর মান ভূমি / অতিভুজ। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কিভাবে কোন কোণের sine এবং cosine এভাবে বের করা যাবে। তোমরা সহজেই প্রশ্ন তুলতে পার ব্যাপারটা যখন এতই সহজ তখন শুধু শুধু অঙ্ক বইয়ের শেষে sine বা cosineর তালিকা রাখার দরকারটা কি!

এককথায় দরকারটা সূক্ষ্মতায়। হাতে তৈরী এই যন্ত্র থেকে খুব বেশি সূক্ষ্মতা আশা করা যায় না। তোমরাই হাতে কলমে করে জানিও এ যন্ত্রের সূক্ষ্মতার মান কতখানি। হার্টলের আলোক চক্রের মতো এই যন্ত্রটি দুটি স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করানো থাকে।

● অসীম চক্রবর্তী

পড়ুয়ার দপ্তর

এ সংখ্যায় 'পড়ুয়ার দপ্তরে'র লেখক হাওড়া জেলা স্কুলের দশম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র।

সুব্রত দাস।

প্রশ্নঃ মাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে? উহা প্রথম কে আবিষ্কার করেন? সংক্ষেপে মাইটোসিস পদ্ধতির বিবরণ দাও। মাইটোসিস পদ্ধতির তাৎপর্য বর্ণনা কর।

উঃ—যে জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় জীবের দেহকোষ বিভক্ত হয়ে জনিতৃ-কোষের সমসংখ্যক ও সমগুণসম্পন্ন ক্রোমোজোমবিশিষ্ট অপত্য নিউক্লিয়াস সহ দুটি নূতন কোষ গঠন করে তাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে।

১৮৭৮ খৃঃ জার্মান বিজ্ঞানী ওয়াল্থার ফ্লেমিং সর্বপ্রথম মাইটোসিস পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস বিভাজন অথবা ক্যারিওকাইনেসিস কতকগুলি নির্দিষ্ট দশার মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়। এজন্য একে পরোক্ষ কোষ বিভাজন বলে। প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস প্রক্রিয়ায় ও পরে সাইটোকাইনেসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম্ বিভাজনের ফলে মাতৃকোষ দুটি অপত্য কোষে বিভক্ত হয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ক্যারিওকাইনেসিস যে দশাগুলির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় সেগুলি হল যথাক্রমে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ। দুইটি মাইটোসিসের মধ্যবর্তী দশাগুলি বা দশাটি ইন্টারফেজ দশা নামে পরিচিত। যখন নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়নি সেই অবস্থাকে বলে স্থির

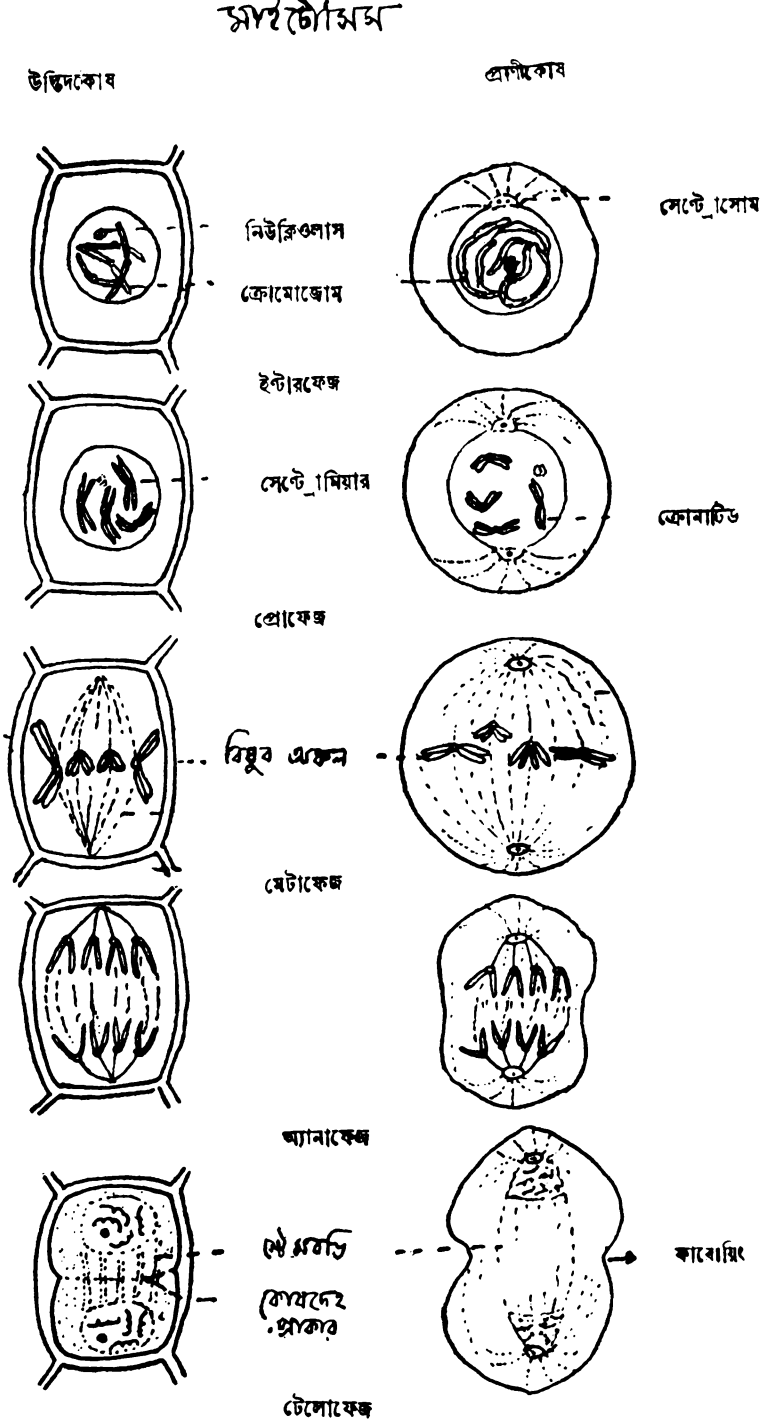

অবস্থা (resting stage) ও নিউক্লিয়াসটিকে বলে স্থির নিউক্লিয়াস। এই অবস্থায় নিউক্লিয়াসের বিপাক কার্য অর্থাৎ নিউক্লিয় বস্তুর সংশ্লেষ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। তাই এই সময় নিউক্লিয়াসটিকে বিপাকীয় নিউক্লিয়াস বলে।

ইণ্টারফেজ দশা : কোষ বিভাজনের পূর্বে কোষের প্রস্তুতি পর্ব যে দশায় চলে তাকে বলে ইণ্টারফেজ দশা। এই দশার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(১) কোষের আয়তন সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়।

(২) কোষস্থ D. N. A, R. N. A ও প্রোটিন সংশ্লেষ বৃদ্ধি পায়।

(৩) নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাস সুস্পষ্ট ও আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

(৪) ক্রোমোজোমগুলি বিক্ষিপ্তাবস্থায় ছড়ানো থাকে।

(৫) সেণ্ট্রোজোম স্পষ্ট ও ২টি সেণ্ট্রিওল দ্বারা গঠিত হয়।

ক্যারিওকাইনেসিস—ইণ্টারফেজ দশার শেষে নিউক্লিয়াস বিভাজন শুরু হয়। ইহার বিভিন্ন দশাগুলি নিম্নরূপ :

(ক) **প্রফেজ দশা :** এই দশায় সমস্ত মাইটোসিস বিভাজনের অর্ধেক সময় লাগে। নিউক্লিয়াসে নিম্নরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় :

(১) নিউক্লিয়াস ক্রমশঃ গোলাকার ও প্রতিসরণশীল হয়ে ওঠে।

(২) ডি-হাইড্রেশন, কণ্ডেনসেশন ও নিউক্লিনেশনের ফলে ক্রোমোজোমগুলি দৃশ্যমান হয়।

(৩) বিশ্রামকারী নিউক্লিয়াস বহুদাকার ধারণ করে। ইহার মধ্যস্থিত নিউক্লিয় জালিকা পৃথকীকৃত হয়ে নির্দিষ্ট জোড়-সংখ্যক পাকানো সুতা বিশিষ্ট ক্রোমোজোম উৎপন্ন করে। প্রতিটি ক্রোমোজোমে ভগিনী ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক থাকলেও একটি অবিভাজিত সেণ্ট্রোমিয়ার অংশে সংযুক্ত থাকে।

(৪) ক্রোমোজোম স্থূল ও খর্বাকৃতি হয়।

(৫) হোমোলগাস ক্রোমোজোমগুলি নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছড়ানো থাকে।

(৬) ক্রমবিলীয়মান নিউক্লিওলাসটি মেটাফেজ দশার পূর্বে অদৃশ্য হয়ে যায়।

(৭) প্রাণীকোষে সেণ্ট্রোজোম দুটি সেণ্ট্রিওলে বিভাজিত হয়ে 180° সরে গিয়ে পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করে।

(খ) **মেটাফেজ দশা :** (১) স্বল্পস্থায়ী দশা।

(২) প্রারম্ভে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

(৩) উদ্ভিদকোষে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম থেকে বাই পোলার স্পিণ্ডল তৈরী হয়। স্পিণ্ডল সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা গঠিত মাকুর মতো বস্তুবিশেষ। ইহার দুই প্রান্তে দুই মেরু ও মধ্যাঞ্চল বরাবর বিষুব অঞ্চলের অবস্থান।

(৪) ক্রোমোজোমগুলি বিষুব অঞ্চলে অবস্থান করে, এই দশায় সুস্পষ্টভাবে ক্রোমোজোমগুলি গণনা করতে পারা যায়।

(৫) ক্রোমোজোমগুলির সেণ্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত স্পিণ্ডল তন্তু, ক্রোমোজোমাল তন্তু এবং স্পিণ্ডলের যে তন্তু মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে কনটিন্যুয়াস তন্তু বলে। মধ্যাংশের তন্তু ইণ্টারজোনাল তন্তু নামে পরিচিত।

(৬) মেটাফেজের শেষ পর্যায়ে সেণ্ট্রোমিয়ারের বিভাজন হয়।

(গ) **অ্যানাফেজ দশা :** (১) সেণ্ট্রোমিয়ারের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়।

(২) ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হওয়ামাত্র উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। উদ্ভিদকোষে স্পিণ্ডল তন্তুর সংকোচনে এবং প্রাণীকোষে ক্রোমোজোমাল তন্তুর সংকোচনে এবং মধ্যাঞ্চলের সংকোচনের ফলে সৃষ্ট স্টেম্‌বডি ও ইণ্টারজোনাল তন্তুর মিলিত প্রচেষ্টায় ক্রোমোটিডগুলি বিপরীত মেরুতে পৌছায়। এইসময় ক্রোমোজোমগুলির স্থিত গুণাবলী ক্রোমাটিডগুলিতে বণ্টিত হয় বলে এইপ্রকার বিভাজন 'সদৃশ বিভাজন' নামে পরিচিত।

(ঘ) **টেলোফেজ দশা :** (১) এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা থেকে নিউক্লিয় পর্দার সৃষ্টি হয়।

(২) অপত্য ক্রোমোজোমের নিউক্লিয়ার অর্গানাইজার অংশ থেকে নিউক্লিওলাস পুনর্গঠিত হয়।

(৩) ক্রোমোটিডগুলি লম্বা ও পাকানো হয়।

(এর পর ৩৩ পাতায়)

হাই ওঠে কেন ?

জীবন ভৌমিক

শনিবার অফিস ফেরতা ট্রামগুলো বেশ ফাঁকা থাকে। সপ্তাহের ঐ একটি দিন আমরা মানে আমাদের অফিসের তিন চারজন বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসে গল্পগুজব করতে করতে ট্রামে বাড়ি ফিরি। তা সেদিন আমাদের চাটুজ্যে আমার পাশে বসে ঘন ঘন হাই তুলছিল আর প্রত্যেকবার হাই শেষ হবার সাথে সাথে 'অঃ মা' বলে টেনে টেনে এমন একটা বিদঘুটে আওয়াজ করছিল যে আমার খুব বিরক্ত লাগছিল। আমি রেগে গিয়ে বললাম, রাত্তিরে কি চুরিটুরি করতে বের হন নাকি মশাই যে এখন একেবারে ঘুমে ডুবে যাচ্ছেন ?

চাটুজ্যে বললে—হাই তুললেই কি ঘুম পাওয়া হল ? আমি জানাই, নয়ত কী ? ঘোষবাবু এক টিপ নস্যি নিয়ে বলল, ঘুম পেলেই ত হাই ওঠে।

আমাদের সাননে বসা এক ভদ্রলোক এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন আর মুচকি মুচকি হাসছিলেন। তিনি বললেন—আমি হাই ওঠার আসল কারণটা জানি। ঘোষবাবু বলল—বলুন ত মশায় শুনি। কত কিছুই ত আমাদের জানা নেই। অথচ রোজই সেসব অজানা ব্যাপার হরদম ঘটছে।

ঐ ভদ্রলোক এবার দুম করে চাটুজ্যেকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বলুন ত, আমরা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিই কেন ?

চাটুজ্যে বলল—কী আশ্চর্য ! এটা আবার জিজ্ঞেস করে কেউ ? নিশ্বাস-প্রশ্বাস না চললে বাঁচব কী করে ? বাঁচার জন্যই—

চাটুজ্যের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম —কী সব ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন ? আসলে উনি জিজ্ঞেস করছেন, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে আমাদের

দেহের মধ্যে কি ঘটছে ?

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক ! প্রতিটি মুহূর্তে আমরা নাক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ছি এবং প্রশ্বাস নিচ্ছি। প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা বাতাস থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ফুসফুসে টেনে নিচ্ছি আর নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরকার দূষিত বাতাস বা গ্যাস বা যাকে বলি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দিই।

চাটুজ্যে বলল—সে ত সবাই জানে। তার সঙ্গে হাই তোলার সম্পর্ক কী ?

ভদ্রলোক বললেন—দারুণ সম্পর্ক রয়েছে। নিদারুণও বলতে পারেন। কারণ এইভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলতে চলতে মাঝে মাঝে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন আমাদের রক্তের অক্সিজেনের তুলনায় কার্বন ডাই অক্সাইড অনেক বেশী জমে যায়। তা আপনার শরীরের মধ্যে যদি এই অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে তা হলে কী হবে ?

চাটুজ্যে বললে—আপনি ত মশাই অনেক কিছু জানেন দেখছি। আমি চাটুজ্যেকে বললাম—ওটা

ত ওনার প্রশ্নের উত্তর হল না? উনি জানতে চেয়েছেন অক্সিজেনের তুলনায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড শরীরের রক্তে বেশী জমে গেলে কী হবে?

চাটুজ্যে বলল—খুব খারাপ হবে।

ট্রামের অন্য যাত্রীরাও আমাদের আলোচনা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। ওদের মধ্যে একজন বলল—সেই খারাপটা যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা হাই তুলি।

—কিন্তু হাই তুলে বিপদ কাটে কী করে, বোঝান দেখি! আমি বিজ্ঞের মত কথাটা ছুঁড়ে চাটুজ্যের পকেট থেকে পান-এর কৌটো বের করে একখানা পান মুখে দিই।

সেই ভদ্রলোক এবার খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন —সেটা আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের শরীরে যখনই অক্সিজেন কমে যায় তখনই মস্তিষ্কে খবর চলে যায় 'কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে অক্সিজেন আন', আর তখনই আমাদের হাই ওঠে। আপনা থেকেই আমাদের মুখটা হা হয়ে যায়। আর ঐ হা করা মুখ দিয়ে একবারে আমরা অনেকটা অক্সিজেন টেনে নিয়ে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দিতে পারি। অনেক সময় দুটো-একটা হাই-এ কাজ হয় না। ঘন ঘন হাই ওঠে। এই যেমন চাটুজ্যে বাবুর উঠছে। হাই ওঠা মানেই ঘুম পাওয়া নয়।—এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক নিজেই বড় করে একটা হাই তুললেন। পরে আরও জানালেন যে খুব খাটাখাটুনি হলে, শরীর অসুস্থ থাকলেও আমাদের হাই ওঠে। শুধু মানুষের নয় জন্তু জানোয়ারেরাও হাই তোলে। কুকুর থেকে বেড়াল বাঘ গণ্ডার সব। বাঁচতে গেলে হাই তুলতেই হবে। তবে আপনি মশাই হাই তুলে যা একখানা ডাক দিচ্ছেন—। চাটুজ্যেকে উদ্দেশ্য করে বলা ঐ কথা শুনে ট্রামশুদ্ধ সকলের কি হাসি! বাকী রাস্তা চাটুজ্যে আর হাই তোলেনি। কাজটা নিশ্চয়ই ভাল করেনি, কি বল?

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

(৪) ডি-নিউক্লিনেশন, ডি-কণ্ডেনসেশন ও বিশেষতঃ হাইড্রেশনের ফলে ক্রোমোজোম দেখা যায় না।

(৫) অপত্য ক্রোমোজোমগুলি দলবদ্ধ হয়ে নিউক্লিয় জালিকা গঠন করে।

(৬) দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়।

সাইটোকাইনেসিস :—টেলোফেজ দশা চলাকালীনই প্রাণীকোষে ও উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি পৃথকভাবে চলে। প্রাণীকোষের পরিধি থেকে আড়াআড়িভাবে মধ্যরেখা বরাবর সঙ্কোচনের ফলে খাজ গভীরতর হয়ে সাইটোপ্লাজমকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি করে। একে ফারোয়িং বা ক্লিভেজ বলে।

উদ্ভিদকোষে স্পিণ্ডলের বিস্তৃত মধ্যভাগে সাইটোপ্লাজমের সাহায্যে ফ্রাগমোপ্লাস্ট গঠন করে। এর থেকে সেলপ্লেট ও তার পরে সেলুলোজ দিয়ে মোটা কোষপ্রাচীর তৈরী হয়। এইভাবে দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিসের তাৎপর্য :

(১) মাইটোসিস একটি সদৃশ বিভাজন। কারণ উৎপন্ন অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটি মাতৃ নিউক্লিয়াসের ন্যায় হুবহু সমপরিমাণ, সম আকৃতিবিশিষ্ট ও সমগুণসম্পন্ন হয়। (২) প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও উপাদান মাতৃনিউক্লিয়াসের সমান হয়। (৩) ক্রোমোজোমস্থিত জিনগুলি সমভাবে বিভক্ত হওয়ায় পিতামাতার দোষগুণ সন্তানের উপর সম্যক ভাবে বর্তায়। (৪) বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের জন্য মাইটোসিস একমাত্র ও একান্ত অপরিহার্য মাধ্যম। (৫) ইহা দ্বারা জীবদেহে খণ্ডস্থান ও নষ্ট অঙ্গের পুনর্গঠন সম্ভব হয়। (৬) কোষে D. N. A% ও R. N. A% এর সমতা রক্ষিত হয়। (৭) বহু এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী এই পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে।

ডঃ বিনোদবিহারী নিয়োগী স্মৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল

(বিষয় : বিজ্ঞানের স্মরণীয় আবিষ্কার)

প্রতিযোগিতায় এত ভাল ভাল সব লেখা এসেছে যে তার থেকে সবচেয়ে ভাল তিনটেকে বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া ভারী মুশ্‌কিলের ব্যাপার। যারা পুরস্কার পেলে না তাদেরও অনেকের লেখা পরে বিজ্ঞান মেলার পাতায় দেখতে পাবে।

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

অন্ধজনে···

তাপস চক্রবর্ত্তী (বয়স ১৪)

আজ থেকে প্রায় একশ' চল্লিশ বছর আগে ফ্রান্সে লুই ব্রেইল নামে এক চর্মকারের ছেলে তার বাবার চামড়ার দোকানে বসে একটা যন্ত্র দিয়ে চামড়ায় ছেঁদা করছিল। হঠাৎ যন্ত্রটা ছিটকে গিয়ে লাগল তার চোখে। ফলে অন্ধ হয়ে গেল ছেলেটি।

কিন্তু কে জানত এই অন্ধ লুই পৃথিবীর সমস্ত অন্ধদের আলোকময় জগতে নিয়ে যাবে। অন্ধ হয়েও কিন্তু কাজ ছাড়ল না লুই।

হত ভাগ্য অন্ধদের কথা ভেবে ভেবে তার মন আরও সতেজ হল। সে সব সময় চিন্তা করত কি করে বিশ্বের সমস্ত অন্ধদের চোখের অভাব পুরণ করা যেতে পারে।

চামড়ায় ছেঁদা করতে করতে তার মাথায় এলো অন্ধদের জন্য নতুন হরফের কথা, চামড়ার উপর যদি হরফের আকারে গভীরভাবে দাগ কাটা যায় তবে অন্ধরা সেই হরফের উপর হাত বুলিয়ে পড়তে পারবে। এই চিন্তা করেই লুই বাবার দোকানে বসে চামড়ার উপর হরফ এর আকারে দাগ কাটতে লাগলেন। এইভাবে লুই ব্রেইল অন্ধদের জন্য নতুন বর্ণমালা সৃষ্টি করলেন, যা অন্ধরা হাত বুলিয়ে পড়তে পারে। তাঁর নামানুসারে এই যুগান্তকারী হরফের নাম রাখা হল ব্রেইল হরফ।

এই নবাবিষ্কৃত হরফ বিশ্বের অগণিত অন্ধদের জীবনে আলো এনে দিয়েছে।

দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

গুটি বসন্ত ও ডঃ জেনার

চঞ্চল সমাজদার (বয়স ১৫)

একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘরে বসে আছেন একজন পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ভদ্রলোক। এখানে তিনি গুটি বসন্ত রোগের গবেষণা করার জন্য এসেছেন। একদিন একজন গ্রাম্য মহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন। কথা প্রসঙ্গে সেই মহিলা ডাক্তারবাবুকে বললেন, "আমার আর গুটি বসন্ত হবে না। কারণ

আমার গো-বসন্ত হয়ে গেছে।" ডাক্তারবাবু ঐ রকম ধরণের কথা সেই প্রথম শুনলেন। তাই তার মাথায় এই চিন্তাটা থেকে গেল। তারপর তিনি এই নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। অবশেষে তিনি গো-বসন্ত হয়ে যাওয়া একটি আট বছরের বালকের দেহে গুটি-বসন্তের জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল ছেলেটির গুটি-বসন্ত হল না। তখন তিনি তাঁর ধারণা অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করলেন। তারপর থেকেই তার জয়জয়কার পড়ে গেল। কে এই ডাক্তারবাবু? ইনি হলেন গুটি বসন্তের 'টীকা' (ভ্যাকসিন) আবিষ্কারক ডঃ এডওয়ার্ড জেনার। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট তাঁকে দু'বার দশ হাজার পাউণ্ড ও কুড়ি হাজার পাউণ্ড দান করেছিল।

ডঃ জেনার ইংরেজী ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গ্লসটার-শায়ারবাসী একজন ধর্মযাজকের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি পড়াশুনায় ভালো ছিলেন না। যৌবনে তিনি একজন শল্য চিকিৎসক ছিলেন। পরে অবশ্য বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি একজন সঙ্গীতপ্রিয়, কবিতাপ্রিয় এবং সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চুয়াত্তর বছর বয়সে তিনি 'বার্কলি'তে মারা যান।

সবশেষে তাঁর সম্বন্ধে একটা গল্প বলি।

একবার তিনি নেপোলিয়নকে ফ্রান্সে বন্দী এক জন ইংরেজকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ করে ছিলেন। নেপোলিয়ন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুরোধ রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি তাঁর মত এক জন লোকের কথা কখনোই ফেরাতে পারি না।"

তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

বাঙালী বিজ্ঞানীর আবিষ্কার

রতনকুমার রায় (বয়স ১১)

বাঙালীর ছেলে এম, এ, পাশ করার পর ডাক্তারী পড়তে ঢুকলেন। আশ্চর্য মেধাবী। আশ্চর্য আত্মভোলা ছাত্র। পড়তে পড়তে সে পৃথিবীর সব কিছু ভুলে যায়।

ছাত্র জীবনের অবসানে কর্মজীবনের শুরু! ছাত্র এখন আর ছাত্র নেই। নানান চিন্তায় মগ্ন এক চিকিৎসক। একটির পর একটি ওষুধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করেন আর ল্যাবোরেটারীতে লিশ্‌ম্যানিয়া—ডোনোভ্যানি জীবাণুর ওপর প্রয়োগ করেন। অদ্ভুত কঠিন জীবন এই জীবাণুগুলোর! সিঙ্কোনা হজম করে দেয়, কুইনিনে কোন ফলই হয় না।

আবার গবেষণা। আরও বিষাক্ত ওষুধের প্রয়োজন যেমন কঠিন ধাতের জীবাণু তেমনি বিষাক্ত ওষুধের প্রয়োজন, এবার তাই অ্যান্টিমনি দিয়ে ওষুধ তৈরি করলেন। প্রয়োগ করলেন লিশ্‌ম্যানিয়া—ডোনোভ্যানি জীবাণুর ওপর। আশ্চর্য! জীবাণুগুলো ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে, দেখতে দেখতে চোখের সামনে নির্জীব হয়ে গেল জীবাণুগোষ্ঠি।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল। এই ওষুধ এত বিষাক্ত যে মানুষ সহ্য করতে পারবেনা। আবার গবেষণা শুরু করলেন। একটি ওষুধ অবশেষে তৈরি করলেন। ওষুধটি ইনজেকশন দিলে রোগী সহ্য করতে পারে, অথচ কালাজ্বরের জীবাণু ও মারা যায়। এই ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত রোগীরা তাঁর ওষুধ ব্যবহার করে আবার সুস্থ জীবন লাভ করল। ওষুধটির নাম ইউরিয়া স্টিবামিন—কালাজ্বরের অমোঘ ওষুধ। এই ঔষুধটির আবিষ্কারক হলেন, খ্যাতনামা বাঙালী বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

ধাঁধা

পটলচাঁদ সকালবেলা চীৎকার করে প্লবতার সূত্র মুখস্থ করছে, ঠিক এমন সময় ছোট-কাকা ঘরে ঢুকে বলল—বল্‌তো, কোন জিনিষ জলে ভাসে?—কোন বস্তুর ওজন যদি বস্তুটির দ্বারা অপসারিত জলের জজনের চেয়ে কম হয় তবে তা জলে ভাসবে—পটল মুখস্থ বলে গেল। ছোটকাকা উত্তর শুনে খুশী, বলল—বেশ, বেশ। আচ্ছা বল্‌তো, একটা সূঁচকে জলে ফেললে তা কি জলে ভেসে থাকবে? পটলচাঁদ বলল—মোটেই না। অপসারিত জলের তুলনায় সূঁচের ওজন ঢের ঢের বেশী। এই দেখ তোমায় করে দেখাচ্ছি—বলে একবাটি জলের মধ্যে একটা সূঁচ ফেলতেই তা টুপ করে ডুবে গেল॥ ছোটকাকা সূঁচটা হাতে নিয়ে বলল—এবার সূচটাকে আমি জলে ভাসিয়ে রাখছি ছাখ্‌। এর পর ছোটকাকা একটা বিশেষ কায়দায় সূঁচটাকে জলে ভাসিয়ে রাখল আর তাই দেখে পটলচাঁদ তো অবাক॥ জলের চেয়ে ভারী হওয়া সত্ত্বেও কোন্ কায়দায় ছোটকাকা সূঁচটাকে জলে ভাসিয়ে রাখলো, আর প্লবতার সূত্র না মেনে কেনই বা সেটা জলে ভেসে থাকলো তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে পটলচাঁদের তো দিন কাবার। উত্তরটা তোমরাই জানিয়ে দাও না হয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর ঃ

মাটিতে রেখে ডিম দুটোকে ঘোরাতে চেষ্টা করলেই দেখা যাবে, সেদ্ধ ডিম দারুণ জোরে ঘুরছে, অথচ কাঁচা ডিম প্রায় ঘোরানই যাচ্ছে না। কারণ? সেদ্ধ ডিম কঠিন বস্তু হওয়ায় ঘোরান অনেক সহজ কিন্তু কাঁচা ডিমের ভেতরে তরল পদার্থ থাকায় সেটা ওপরের খোলার গতিকে প্রচণ্ড বাধা দেয়। জাড্যের নিয়ম বা force of inertia-র ফলেই তা থেমে আসতে থাকে বা আদৌ ঘুরতে না পেরে কয়েকবার টাল খেয়ে যায় মাত্র।

এছাড়া ধাঁধাটার আরও একটা উত্তর হয়—যা ছড়ায় লিখে পাঠিয়েছে দমদম থেকে লিলি ও রুমা কুণ্ডু।

বলল প্যালা মুচকি হেসে
ভাবছ পিসে ঠকব শেষে?
মগজ আমার নয়ক মেকী
তোমার ধাঁধা এমনটা কি!
শোন তুমি মন্‌টি দিয়ে,
নধর দুটি ডিম্ব নিয়ে;
ধর চোখের সামনে এনে,
তাকাও এবার আলোর পানে
দেখবে একটা লালচে মত
অন্যটা তো নয়ক তত
লালচে যেটা কাঁচা সেটাই
অন্যটা দাও ক্ষিধে মেটাই।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম : প্রদীপ দেবশর্মা, নবদ্বীপ; পার্থ নাগ, বারাসত।

A

WELL WISHER

BIJNAN MELA JANUARY 1982 Rs. 1.50
Post Regd. WB/SC—200 Vol. 2 No. 1 Regn. No. R. N. 37306/81

জন্মদিনের উপহার

Published by Amal Ghosh from 29/2, Beniatola Lane, Cal.-700009 and Printed by Satyanarayan Press, 1, Ramaprasad Roy Lane, Cal-700006 and Cover Printed by Perfect Press, 32A, Patuatola Lane, Cal.-9